POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিরুদ্ধেই যায়।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 2

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

14 ই জানুয়ারী, 2021 ● 29 জামাদিউল আওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

নীরবে এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার নির্দেশ

৯৩৪) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: জুমার সময় ইমাম যখন খুতবা প্রদান করে, তখন যদি তুমি তোমার সঙ্গীকে চুপ থাকতে বল, তবে তুমিও বাজে কথা বলেছ ।
(সহী বুখারী, ২য় খ-, কিতাবুল জুমআ)

৯৬২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) , হযরত আবু বাকার, হযরত উমর এবং হযরত উসমান রাজিআল্লাহু আনহুম এর সঙ্গে ঈদের নামায পড়েছি । তাঁরা সকলে খুতবার পূর্বে নামায পড়তেন ।

৯৬৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) ঈদুল ফিতর এর দিন দুই রাকাত নামায পড়েছেন । এর পূর্বেও তিনি কোন (নফল) পড়েন নি আর পশ্চাতেও পড়েন নি । অতঃপর তিনি মহিলাদের কাছে আসেন আর হযরত বিলাল (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে সদকা করার আদেশ করলে তারা সদকা দিতে শুরু করে । কোন মহিলা নিজের কানের দুল ছুড়ে ফেলছিল আর কেউ নিজের হার খুলে দিচ্ছিল ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন)

এই সংখ্যায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৭ নভেম্বর ২০২০
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৪ ঠা ডিসেম্বর ২০২০

খোদা তা'লা কোনও জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তনে তৎপর হয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্রশাসনের আনুগত্য

কুরআন করীমের আদেশ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ (আন নিসা: ৬০) কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনের আনুগত্য করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। কেউ যদি বলে, সরকার 'মিনকুম' (আমাদের মধ্য) এর মধ্যে পড়ে না, তবে এটি তার স্পষ্ট ভুল। সরকারের যে নির্দেশ ইসলামি বিধানসম্মত, সেটি 'মিনকুম' এর অন্তর্ভুক্ত। যারা আমাদের বিরোধীতা করে না, তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন করীমের শিক্ষার ইঙ্গিত থেকে প্রমাণ হয় যে, সরকারের আনুগত্য করা উচিত এবং তার নির্দেশ মেনে চলা উচিত।

সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করা উচিত

পুণ্য ও তাকওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত আর সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করা উচিত। তবেই আমরা কিছু অর্জন করতে পারব। اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (আর রাদ: ১২) খোদা তা'লা কোনও জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তনে তৎপর হয়।..... মানুষের জন্য আবশ্যক হল খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া এবং অধিকার আত্মসাৎ ও ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকা। এটি সুস্পষ্টভাবে একটি প্রমাণিত সত্য যে, অনেক সময় যখন কোন এক ব্যক্তি কোন অসৎ কাজ করে, তখন সে সমগ্র শহর ও পরিবারের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব অসৎকর্ম পরিহার কর, কেননা তা ধ্বংসের কারণ।

কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহকারে নামায পড়

খোদা তা'লার কাছে আশ্রয় নাও এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহকারে নামায পড়। অনেক সময় মানুষ একবার মাত্র নামায পড়ে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, নামায থেকে অব্যহতি নেই। পয়গম্বররাও নামায থেকে অব্যহতি পান নি।একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে একদল নবাগত মুসলমান উপস্থিত হয়ে নামায থেকে অব্যহতি প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) বলেন, ক্রীয়াকলাপ বর্জিত ধর্ম, মোটেই কোন ধর্ম নয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৮-২৪০)

আপনি একথা কেন বলছেন যে সে ধর্মীয় কাজে মগ্ন থাকলে ভাইয়ের আশ্রিত হয়ে থাকবে?

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: আমার মনে আছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) এ সময়ে যখন মীর মহম্মদ ইসহাক সাহেবের শিক্ষার যুগ এল, (মীর সাহেব আমার থেকে পৌনে দুই বছরের ছোট ছিলেন) তখন আমাকে কি পড়ানো যায় তা নিয়ে আমার নানাজান মরহুম হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন । তিনি বললেন, একে ধর্মীয় শিক্ষা দিন । এক ছেলেকে তো আপনি জাগতিক শিক্ষা দিয়েছেন, একে ধর্মীয় শিক্ষা দিন । একথা শুনে নানাজান মরহুম নিজের পক্ষ থেকে কিম্বা নানি আম্মার পক্ষ থেকে বললেন, তবে তো এ এর ভাইয়ের আশ্রিত হয়ে থাকবে । তিনি যখন এই কথা বললেন, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (লা.) বললেন, খোদা অনেক অনেক সময় এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির কারণে জীবিকা দান করেন । আপনি একথা কেন বলছেন যে সে ধর্মীয় কাজে মগ্ন থাকলে ভাইয়ের আশ্রিত হয়ে থাকবে? আপনি একথা কেন বলছেন না যে, সে ধর্মের সেবা করলে এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তার ভাইয়ের উপার্জনেও আশিস দান করবেন? অতঃপর তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর একটি ঘটনা শোনান । তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অন্তরে এই বাসনার উদ্রেক হয় যে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর বৈঠকে বসে তাঁর কথা শুনবেন । তাই তো তিনি দিনরাত মসজিদে বসে থাকতেন, যাতে রসুল করীম (সা.) যখন বাইরে আসবেন আর কোনও কথা বলবেন তা শোনা থেকে যেন বঞ্চিত না হন । তাঁর হাদীস বর্ণনার বিশালত্ব দেখে অনেকে মনে করে, আবু হুরাইরাহ হয়তো অনেক জ্যেষ্ঠ সাহাবা ছিলেন । মোটেই নয়, বরং তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পূর্বে ঈমান এনেছিলেন । কিন্তু তিনিই সব থেকে বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন । আর এই কারণেই লোকে অনেক জ্যেষ্ঠ সাহাবাদের না চিনলেও হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)কে চেনেন । কারণ হাদীসে বার বার বর্ণিত হয়েছে, 'আবু হুরাইরাহ অমুক বলেছেন, আবু হুরাইরাহ সেই কথা বলেছেন ।' মোটকথা তিনি অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । যার কারণে তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মজলিস সম্পর্কে সংকল্প করেছিলেন যে, যেহেতু লোকেরা তাঁর মুখ থেকে অনেক কিছু শুনেছেন আর তিনি সব শেষে ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাই তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করবেন না । সুতরাং যেভাবে কুরায়েশরা মক্কায় এসে বসে পড়েছিল, তিনিও মসজিদের এসে বসে পড়েন । আর

(শেষাংশ ৭ এর পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হে আল্লাহর রসূল! আমি যদিও সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু আমি আপনার সাহায্যকারী হবো। (হযরত আলি)

আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদা, তাঁর জামাতা আবু তুরাব হযরত আল মুরতাজা (রা.)–এর জীবনালেখ্য ।

“হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ার একদিন পর হযরত আলী বিন আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন তাঁর বয়স ছিল তেরো বছর।

চারজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব, যারা হলেন– মাননীয় ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব শহীদ মাঢ় বিল্লুচাঁ নানকানা সাহেব (পাকিস্তান), মাননীয় জামালুদ্দীন মাহমুদ সাহেব অফ সিরালিওন, মাননীয়া আমাতুস সালামা সাহেবা (সাবেক নাযেম জায়েদাদ ও আইনি উপদেষ্টা চৌধুরী সালাহুদ্দীন সাহেবের স্ত্রী) এবং মাননীয় ডক্টর লতিফ আহমদ কুরায়েশি সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া মানসুরা বুশরা সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৭ শে নভেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২৭ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তাআব্বুয, তাসমিয়া ও সূরা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আজ হযরত আলী বিন আবি তালিবের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। হযরত আলী বিন আবি তালিব বিন আব্দিল মুত্তালিব বিন হাশেম; তার পিতার নাম ছিল আবদে মানাফ, যার ডাকনাম ছিল আবু তালিব। তার মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম। তিনি মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর শারীরিক গঠন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে– তিনি মাঝারি গড়নের ছিলেন, চোখ কালো ছিল; তার শরীর মোটাসোটা ও কাঁধ চওড়া ছিল।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৪৬৪) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৬৪) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৮)

হযরত আলীর মা তার নাম নিজের পিতার নামের সাথে মিলিয়ে আসাদ রেখেছিলেন, আর তার জন্মের সময় আবু তালিব বাড়িতে ছিলেন না। যখন আবু তালিব ফিরে আসেন, তখন তিনি তার নাম আসাদের পরিবর্তে আলী রাখেন। হযরত আলীর তিনজন ভাই ও দু'জন বোন ছিলেন। তার ভাইয়েরা হলেন তালিব, আকীল ও জা'ফর এবং বোনেরা হলেন উম্মে হানি ও উম্মে জামানা। এদের মধ্যে তালিব ও জামানা ছাড়া বাকি সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৫-২৯৭)

হযরত আলীর ডাকনাম ছিল আবুল হাসান, আবু সাবতাইন ও আবু তুরাব।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৪৪১) (সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৪১)

সহীহ বুখারীর বর্ণনানুসারে হযরত সুহায়ল বিন সা'দ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ফাতেমার ঘরে গিয়ে হযরত আলীকে ঘরে পান নি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?' হযরত ফাতেমা বলেন, 'তার ও আমার মধ্যে কিছু বাকবিতণ্ডা হয়েছিল, এতে তিনি আমার ওপর রাগ করে চলে যান আর আমার ঘরে 'কায়লুলা' (দুপুরের বিশ্রাম)-ও করেন নি।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন একজনকে বলেন, 'দেখ তো সে কোথায়!' সেই ব্যক্তি এসে বলে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন।' রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন মসজিদে যান এবং হযরত আলী সেখানে শুয়ে ছিলেন, তার শরীর থেকে তার চাদর সরে গিয়েছিল এবং পার্শ্বদেশে বা কোমরে কিছুটা মাটি লেগে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্(সা.) মাটি মুছে দেন এবং বলেন, 'হে আবু তুরাব, (মাটির বাবা) ওঠো! হে আবু তুরাব, ওঠো!'

(সহী বুখারী কিতাবুস সলাত, হাদীস-৪৪১)

তখন থেকে তিনি এই আবু তুরাব ডাকনামে পরিচিত হন। তিনি যেভাবে মহানবী (সা.)-এর অভিভাবকত্বে এসেছিলেন সেই বিষয়ে বর্ণিত আছে। মুজাহিদ বিন জাবার আবুল হাজ্জাজ বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কুরায়শদের উপর এক বড় দুর্যোগ নেমে আসা হযরত আলীর জন্য আশীর্বাদ আর মঙ্গল ও কল্যাণের কারণ হয়। হযরত আবু তালিবের পরিবার অনেক বড় ছিল। এজন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের চাচা আব্বাসকে, যিনি বনু হাশেমের মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছল ব্যাক্তি ছিলেন– গিয়ে বলেন, 'হে আব্বাস! আপনার ভাই আবু তালিবের পরিবার অনেক বড়; এই দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষজন কী অবস্থায় আছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন! আপনি আমার সাথে চলুন যেন আমরা গিয়ে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারি। তার পুত্রদের মধ্য থেকে একজনের দায়িত্ব আমি নিই, আর [হযরত আব্বাসকে বলেন,] একজনের দায়িত্ব আপনি নিন।' তিনি (সা.) বলেন, 'আমরা তাদের দু'জনের জন্য আবু তালিবের দায়িত্ব পালন করব।' হযরত আব্বাস বলেন, 'ঠিক আছে।' তারা দু'জন হযরত আবু তালিবের কাছে আসেন এবং বলেন, 'আমরা আপনার পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার কিছুটা লাঘব করতে চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বর্তমান দুরাবস্থা দূর হয়।' হযরত আবু তালিব বলেন, 'আকীলকে আমার কাছে থাকতে দাও; তাকে বাদ দিয়ে তোমরা যা চাও করতে পার।' অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলীর হাত ধরে তাকে নিজের বুকে টেনে নেন এবং হযরত আব্বাস জা'ফরকে নিজের কাছে টেনে নেন। হযরত আব্বাস জাফর (রা.)কে নিয়ে গেলেন এবং নিজের সাথে রাখলেন। আল্লাহ তা'লা কর্তৃক মহানবী (সা.) -কে নবী হিসাবে প্রেরণ করা পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। এর হযরত আলী তাকে অনুসরণ করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর (সা.) সত্যায়ন করেন; আর হযরত জাফর হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে থাকেন, আর তিনি অর্থাৎ হযরত জাফর (রা.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন, ফলে হযরত আব্বাস (রা.) হযরত হযরত জাফরের বিষয়ে দায়মুক্ত হয়ে যান।"

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৫)

এর রেওয়ায়েতটি নেওয়া হয়েছে তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। এই ঘটনাটিই হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন-

"আবু তালেব খুবই সম্মানিত একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু দরিদ্র ছিলেন; আর অনেক কষ্টে তার জীবন নির্বাহ হতো। বিশেষতঃ সেই দিনগুলোতে; যখন মক্কায় এক দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল, তখন তার দিন খুবই কষ্টে চলতো। মহানবী (সা.) যখন তাঁর চাচার এই অবস্থা দেখেন, তখন তিনি তার অন্য চাচা আব্বাস (রা.)কে একদিন বলেন যে, 'চাচা, আপনার ভাই আবু তালেবের জীবনযাত্রা কষ্টে চলছে। যদি তার ছেলেদের মধ্য থেকে একজনকে আপনি আপনার ঘরে নিয়ে যান, আর একজনকে আমি নিয়ে আসি- তবে তা কতইনা ভালো হয়! আব্বাস (রা.) এই প্রস্তাবে একমত হলেন। এরপর দু'জনে মিলে আবু তালেবের কাছে গিয়ে তাকে এ প্রস্তাব দিলেন। তিনি তার সন্তানদের মধ্যে আকীলকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি বলেন, 'আকীলকে আমার কাছে রেখে দাও বাকীদেরকে যদি চাও নিয়ে যাও।' অতএব জাফরকে আব্বাস (রা.) নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন আর আলীকে (রা.) মহানবী (সা.) নিজের কাছে নিয়ে যান। হযরত আলী (রা.)-এর বয়স তখন আনুমানিক ছয় সাত বছর ছিল। এরপর থেকে হযরত আলী (রা.) সবসময় মহানবী (সা.) এর কাছে থাকেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১১১)

হযরত আলী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ার একদিন পর হযরত আলী বিন আবু তালিব

(রা.) আসেন।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি (রা.) মহানবী (সা.) এবং হযরত খাদিজা (রা.)-কে নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'হে মুহাম্মদ (সা.)! এটি কি?' জবাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'এটি আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ধর্ম এবং এটিসহ রসূলদের প্রেরণ করেছেন। অতএব আমি তোমাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি আর লাত ও উযযাকে প্রত্যাখানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।" একথা শুনে হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, "আজকের পূর্বে এমন কথা আমি কখনো শুনি নি। আবু তালিবের সাথে আলোচনার পূর্বে আমি এ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারব না।" রসূলুল্লাহ্ (সা.) চান নি যে তাঁর নবুয়্যতের ঘোষণা প্রদানের পূর্বে বিষয়টির গোপনীয়তা প্রকাশ হোক। তাই মহানবী (সা.) বলেন, "হে আলী! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, ঠিক আছে; তবে বিষয়টি গোপন রাখবে।" অতঃপর হযরত আলী (রা.) সেই রাত কাটান এবং আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী (রা.)-র হৃদয়ে ইসলামকে প্রবিষ্ট করেন। পরদিন সকালে তিনি (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, 'হে মুহাম্মদ (সা.)! গতরাতে আপনি আমাকে কিসের কথা বলছিলেন?' রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "তুমি সর্বান্তকরণে সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। লাত এবং উযযাকে অস্বীকার কর এবং আল্লাহ্ তা'লার শরীকদের থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দাও।" অতএব হযরত আলী (রা.) এমনটি-ই করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু তালিবের ভয়ে হযরত আলী (রা.) চুপিসারে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতেন এবং নিজের মুসলমান হওয়ার কথাটি গোপন রাখেন;

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৮৮-৮৯)

অথচ সেখানেই থাকতেন, কেননা বিভিন্ন বর্ণনায় এটিই দেখা যায়। এটি মূলতঃ উসুদুল গাবার বর্ণনা।

হযরত খাদিজার পর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন হযরত আলী (রা.)। তখন তার বয়স ছিল তের বছর। অন্য কিছু রেওয়ায়েতে পনের, ষোল এবং আঠার বছরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য়খণ্ড, পৃ: ২০০)

পুরুষদের মধ্যে প্রথমে কে ঈমান এনেছিলেন, হযরত আবু বকর, হযরত আলী, নাকি হযরত যায়েদ- জীবনী লেখকগণ এ বিতর্কেও লিপ্ত হয়েছেন। অনেকের চূড়ান্ত গবেষণা মোতাবেক বালকদের মধ্যে হযরত আলী এবং বড়দের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং দাসদের মধ্যে হযরত যায়েদ। এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবও নিজের একটি অভিমত উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, "হযরত খাদিজার পরে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ-কেউ হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কুহাফার নাম উল্লেখ করেন; কেউ-কেউ হযরত আলীর কথা বলেন, যার বয়স তখন কেবল দশ বছর ছিল আর কেউবা মহানবী (স.) এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার নাম উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এসব বিতর্ক বৃথা। হযরত আলী এবং যায়েদ বিন হারেসা মহানবী (স.) এর ঘরের লোক ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের ন্যায় তাঁর সাথে থাকতেন। মহানবী (স.) এর বলা আর তাদের ঈমান আনা (স্বাভাবিক বিষয়); সত্য কথা হলো তাদের পক্ষ থেকে হয়তো কোন মৌখিক স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন ছিল না। অতএব তাদের নাম মাঝে আনার কোন প্রয়োজনই নেই।" অর্থাৎ মহানবী (স.) এর বলা এবং তাদের ঈমান আনা স্বাভাবিক বিষয়। তাদের পক্ষ থেকে মৌখিক কোন স্বীকারোক্তির প্রয়োজনই নেই। তাই এর মধ্যে তাদের নাম আনার দরকারই নেই। "বাকীদের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবেই হযরত আবু বকর সর্বাগ্রে রয়েছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ঈমানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (র.) বলেন: "হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাচনা করে একজন সাহায্যকারী পেয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ (স.) এর মহিমা দেখুন; তিনি না চাইতেই একজন সাহায্যকারী পেয়েছেন।" এখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খাদিজার (রা.) উল্লেখ করতে চাচ্ছেন এবং বলছেন, হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (সা.) সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার মহিমা দেখো যে তিনি (সা.) না চাইতেই একজন সাহায্যকারী পেয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁর সেই স্ত্রী যার প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা ছিল, সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর (স.) প্রতি ঈমান আনেন। যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীন আর কেউ কাউকে বলপূর্বক মানাতে পারে না, এজন্য যখন তিনি (সা.) হযরত খাদিজার কাছে খোদা তা'লার প্রথম ওহী সম্পর্কে বলেন, তখন মহানবীকে সঙ্গ না দিয়ে "আমি বুঝে শুনে কোন সিদ্ধান্ত নিব" বলা তার জন্য অসম্ভব ছিল না।' কিন্তু না; হযরত খাদিজা কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই কালবিলম্ব না করে আর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই তাঁর দাবীর সমর্থন করেন এবং মহানবী (স.) এর এ দুঃচিন্তা দূর হয়ে যায় যে, 'হয়তো খাদিজা আমার প্রতি ঈমান না-ও আনতে পারে'- এবং সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী হযরত খাদিজাই। খোদা তা'লা যেন তখন আরশের ওপর বসে বলছিলেন 'আ লাইসাআল্লাহু বিকাফিন আবদাহ' অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! খাদিজার প্রতি তোমার প্রেম ভালবাসা ছিল, আর তোমার অন্তরে এ ধারণা ছিল যে, খাদিজা না আবার আমাকে ত্যাগ করে বসে এবং তুমি এ চিন্তায় ছিলে যে, 'খাদিজা কি আমার প্রতি ঈমান আনবে নাকি আনবে না?' কিন্তু আমরা তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করেছি, না কি করি নি?'' হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এরপর যখন তার ঘরে খোদার ওহী সম্পর্কে কথা হল তখন তাঁর ঘরে লালিত দাস যায়েদ বিন হারেস, এগিয়ে আসে এবং বলে, 'হে আল্লাহ্র রসূল (স.)! আমি আপনার প্রতি ঈমান আনছি।'

এরপর হযরত আলী, যার বয়স তখন এগার বছর ছিল এবং যিনি তখনও নিতান্ত একজন বালক ছিলেন, আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মহানবী (স.) এবং হযরত খাদিজার কথোপকথন শুনছিলেন; তিনি যখন এসব শুনলেন যে, খোদার বাণী এসেছে, তখন সেই আলী যিনি একজন বিচক্ষণ বালক ছিলেন; সেই আলী যার ভেতর পুণ্য ছিল, সেই আলী যার পুণ্যের উচ্ছ্বাস ছিল কিন্তু বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সেই আলী যার চিন্তা চেতনা ছিল অতি উচ্চমার্গের কিন্তু তখনো বুকের মাঝেই চাপা ছিল আর সেই আলী যার মাঝে আল্লাহ তা'লার গ্রহণীয়তার বৈশিষ্ট অন্তর্নিহিত রেখেছিলেন কিন্তু তখনো তিনি কোন সুযোগই পান নি! তিনি যখন দেখলেন, এখন আমার আবেগ অনুভূতি উদ্ভাসিত হওয়ার সময় এসে গেছে, তিনি যখন দেখেন, এখন আমার আবেগ অনুভূতি বিকশিত হবার সুযোগ এসে গেছে, তিনি যখন দেখেন, এখন খোদা আমাকে নিজের দিকে আহ্বান করছেন, তখন সেই নাবালক আলী একবুক বেদনা নিয়ে কাচুমাচু হয়ে একান্ত লজ্জাবনত শিরে এগিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাচী যার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন, যে বিষয়ে যায়েদ ঈমান আনয়ন করেছে তাতে আমিও ঈমান আনছি। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ:১২৭-১২৮)

তবরীর ইতিহাসে লেখা আছে, নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) মক্কার উপত্যকায় চলে যেতেন আর হযরত আলীও চাচা আবু তালেব এবং অন্যান্য চাচা ও গোত্রের সব লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে চলে যেতেন। উভয়েই সেখানে নামায আদায় করে সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। এমনি ধারা চলছিল, অবশেষে একদিন আবু তালেব তাদের দু'জনকে নামায আদায় করতে দেখে ফেলে এবং মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে, হে আমার ভাতিজা! তোমাদেরকে আমি এ কোন ধর্মের অনুসরণ করতে দেখছি। তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, হে আমার চাচা! এটি আল্লাহর ধর্ম, তাঁর ফেরেশতাকুলের ধর্ম, তাঁর রসূলদের ধর্ম আর আমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহীমের ধর্ম বা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কথা বলেন। সেই সাথে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'লার এর সাথে আমাকে মানুষের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। আর হে চাচা! আপনি এ বিষয়ের অগ্রাধিকার রাখেন যে, আমি আপনাকে নসীহত করি আর আপনাকে হেদায়েতের পানে আহ্বান জানাই এবং আমাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বা সাহায্য করার ক্ষেত্রে আপনিই সর্বাধিক উপযুক্ত ও যোগ্য বা এমন কোন কথা বলে থাকবেন। একথা শুনে আবু তালেব বলেন, হে আমার ভাতিজা! আমি আমার ও আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম যাতে তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা পরিত্যাগ করার ক্ষমতা রাখি না কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি যতদিন জীবিত আছি কোন অপ্রীতিকর বিষয় তোমার কাছেও ভিড়তে পারবে না।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ২২৫)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব উক্ত ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন: একবার মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (রা.) মক্কার কোন একটি উপত্যকায় নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ আবু তালেব সেদিক দিয়ে যায়। তখনো আবু তালেব ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এজন্য, সে খুবই অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। তিনি (সা.) যখন নামায সমাপ্ত করেন তখন সে জিজ্ঞেস করে, হে ভাতিজা! এটা কোন ধর্ম যা তোমরা অবলম্বন করেছ? মহানবী (সা.) বললেন, চাচা! এটি ঐশী ধর্ম এবং ইব্রাহীমের ধর্ম। তিনি (সা.) সংক্ষেপে আবু তালেবকে ইসলামের তবলীগ করেন কিন্তু আবু তালেব একথা বলে এড়িয়ে যায় যে, আমি আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবো না কিন্তু একই সাথে তার পুত্র হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলে, হে আমার পুত্র! তুমি নির্দ্বিধায় হযরত মহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গ দিয়ে যাও কেননা আমি বিশ্বাস রাখি, সে তোমাকে পুণ্য ছাড়া অন্য কোন দিকে আহ্বান করবে না। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২৭)

আল্লাহ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী মহানবী (সা.) -এর নিজ আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করার ঘটনার উল্লেখ এক জায়গায় এভাবে পাওয়া যায়, হযরত বারা বিন আযেব বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন 'ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন' আয়াত অবতীর্ণ হলো অর্থাৎ তুমি তোমার পরিবার পরিজন তথা আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক কর; তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আলী! আমাদের জন্য এক সা' আহার্যের সাথে ছাগলের রান রান্না করো।

অপর এক রেওয়ায়েতে সা' এর স্থলে মুদ্ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সা' চার মুদ্দ ছিল অর্থাৎ আড়াই শেরের কিছু কম বা আড়াই কিলোও বলা যায়। এখানে এটিও বর্ণিত হয়েছে কুফা এবং ইরাকবাসীর সা' ছিল আট মুদ্দে'র অর্থাৎ চার শের অথবা সাড়ে চার শেরের মত কিন্তু তা আড়াইশের হোক বা চার শের, যাই হোক হোক না কেন তা পরিমাণে ছিল খুবই সামান্য। নিজ বংশের লোকদেরকে দেওয়াত দেয়ার ছিল আর এ উদ্দেশ্যে খাবার তৈরীর কথা ছিল। তিনি বলেন, আমাদের জন্য বড় এক পেয়ালা দুধের ব্যবস্থা করো আর বনু আব্দুল মুত্তালেবকে একত্রিত করো। হযরত আলী বলেন, আমি এমনটাই করলাম, সবাই একত্রিত হয়। তারা প্রায় এক কম বা বেশি চল্লিশজন হবে। এদের মাঝে তাঁর চাচা আবু তালেব, হামজা, আব্বাস এবং আবু লাহাবও ছিল। আমি তাদের সামনে খাবারের সেই বড় পাত্রটি পরিবেশন করি, তখন মহানবী (সা.) সেই পাত্র থেকে মাংসের একটি টুকরা নেন আর নিজের দাঁত দিয়ে সেটি ছিঁড়ে বরকতের জন্য পাত্রের চতুর্দিকে তা ছড়িয়ে দেন আর বললেন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও। লোকেরা সবাই পেটভরে খায়। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের সবার সামনে যে খাবার পরিবেশন করেছিলাম তা কেবল একজন ব্যক্তির পেটভরার মত ছিল। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, লোকদের পান করাও, অতএব আমি দুধের সেই পেয়ালা নিয়ে আসি আর সবাই এথেকে তৃপ্তির সাথে পান করে। আল্লাহ্‌র কসম, এর পুরোটা কেবল এক ব্যক্তিই পান করতে পারতো। অতঃপর মহানবী (সা.) যখন উপস্থিত লোকদের সাথে কথা বলতে চাইলেন তখন আবু লাহাব চট করে বলল যে, দেখ তোমাদের সাথি তোমাদের ওপর কেমন জাদু করেছে। এরপর তারা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বা সেখান থেকে চলে যায় আর মহানবী (সা.) তাদের সাথে কথা বলতে পারেন নি। পরের দিন তিনি (সা.) বলেন, হে আলী! গতকাল যে খাবার এবং পানীয় তুমি প্রস্তুত করেছিলে ঠিক তেমনিই আবার প্রস্তুত কর; আমি তা-ই করি। আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করি আর মহানবী (সা.)ও ঠিক তা-ই করলেন যা তিনি গতদিন করেছিলেন অর্থাৎ খাবারে বরকত দান করেছিলেন। এরপর তারা সকলে তৃপ্তির সাথে খায় ও পান করে। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন হে বনু আব্দুল মুত্তালেব! আমি আরবের কোন যুবককে জানি না যে তার জাতির জন্য আমি যা নিয়ে এসেছি এর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে আসতে পারে। আমি তোমাদের জন্য ইহ ও পরকালের কল্যাণকর বিষয়াদি নিয়ে এসেছি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এতে কে আমাকে সাহায্য করবে? হযরত আলী (রা.) বলেন, সবাই নীরব থাকে এবং আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদিও সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু আমি আপনার সাহায্যকারী হবো।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এ বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, একটি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা কর এবং এতে বনুআব্দুল মুত্তালেবকে ডাকো যেন এভাবে তাদের মাঝে সত্যের বাণী পৌঁছানো যায়। হযরত আলী (রা.) নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা.) তাঁর সকল নিকট আত্মীয়কে যাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশজন ছিল এই নিমন্ত্রণে ডাকেন। তাদের আহার শেষে মহানবী (সা.) কিছু বলতে চাইলে দুর্ভাগা আবু লাহাব এমন কথা বলে বসে যার কারণে সকলেই সেখান থেকে উঠে চলে যায়। এরপর মহানবী (সা.) তখন হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, এই সুযোগ হাত ছাড়া হচ্ছে তাদেরকে আবার নিমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করো। অতএব তাঁর (সা.) আত্মীয় স্বজন আবারও একত্র হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, হে বনু আব্দুল মুত্তালেব! আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয়নিয়ে এসেছি যে, এর চেয়ে উত্তম কোন বিষয় কোন ব্যক্তি তার জাতির কাজে নিয়ে আসে নি। আমি তোমাদেরকে খোদার পানে আহ্বান করছি, তোমরা আমার কথা গ্রহণ করলে ইহ ও পরকালের সর্বত্তোম কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হবে। এখন বল, এ কাজে কে আমার সাহায্যকারী হবে। সবাই নীরব ছিল আর সভার সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে ছিল। হঠাৎ করে একদিক থেকে তের বছর বয়সী এক শীর্ণকায় বালক যার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, উঠে দাঁড়ালো এবং বললো যে, যদিও আমি সবচেয়ে দুর্বল এবং সর্বকনিষ্ঠ তবুও আমি আপনার সঙ্গ দিব। এটি ছিল হযরত আলী (রা.)-এর কথা। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর এই কথা শুনে নিজ আত্মীয়স্বজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে এই বালকের কথা শোন এবং তার কথা মেনে নাও। উপস্থিত সকলে এ দৃশ্য দেখে শিক্ষাগ্রহণ করার পরিবর্তে অট্টহাসি হেসে ওঠে এবং আবু লাহাব নিজ বড় ভাই আবু তালেবকে উদ্দেশ্য করে বলে, নাও! এখন মুহাম্মদ তোমাকে তোমার ছেলের অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করছে। অতঃপর এই লোকেরা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর অসাহয়ত্ব নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে করতে সেখান থেকে বিদায় নেয়। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২৮-১২৯)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেন, বিশেষ করে শিশু কিশোরদের এটি মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত কেননা হযরত আলী (রা.) মাত্র ১১ বছর বয়সে ধর্মের সমর্থনে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হয় তখন তিনি (সা.) একটি দাওয়াতের আয়োজন করেন যেখানে মক্কার বড় বড় সম্পদশালীদের ডাকেন এবং তাদেরকে খাবার খাওয়ান। তারপর তিনি (সা.) বলেন, আমি আমার দাবী সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এটি শুনে সবাই পলায়ন করে। এ দৃশ্য দেখে হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, হে আমার ভ্রাতা! আপনি এটি কী করলেন? এরা জগতপূজারী মানুষ। এদেরকে প্রথমে তবলীগ এবং পরে খাওয়ানো উচিত ছিল। এই বেঈমানেরা তো খাবার খেয়েই পালিয়ে গেছে কেননা এরা তো খাবারের লোভী। আপনি যদি প্রথমে কথা বলতেন, দুই ঘণ্টা তবলীগ করলেও তারা বসে শুনতো, এরপর তাদের খাবার খাওয়াতেন। মহানবী (সা.) এটি করেন অর্থাৎ তাদেরকে আবার দাওয়াত দেন কিন্তু এবার প্রথমে কিছু কথা শুনিয়ে তারপর খাবার খাওয়ান। তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়েছি। তোমাদের মাঝে কি কেউ আছে যে আমায় সাহায্য করবে এবং এ কাজে আমার সাহায্য করবে? মক্কার সকল বড় বড় লোক বসে থাকে কেবল হযরত আলী (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আমি আপনাকে সাহায্য করবো। মহানবী (সা.) ভাবলেন, সে তো নিতান্ত এক বালক, তাই তিনি (সা.) আবার দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের মাঝে কি কেউ আছে যে আমাকে সাহায্য করবে? এবারও সকল বয়োবৃদ্ধরা বসে রইল এবং সেই ১১ বছরের বালক দাঁড়িয়ে যায় আর বলে, হে আমার চাচাতো ভাই! আমি আছি তো। আমি আপনাকে সাহায্য করবো। মহানবী (সা.) তখন বুঝে গেলেন, খোদার দৃষ্টিতে এই ১১ বছরের বালকই যুবক আর এই বয়োবৃদ্ধরা সকলেই শিশু। তাদের মাঝে কোন শক্তি নেই। এই বালকই বুদ্ধিমান তাই তিনি (সা.) তাকে নিজের সঙ্গী করে নিলেন। আর সেই হযরত আলীই শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং তাঁর (সা.) পরে খলীফাও হন। তিনি (রা.) ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করেন এবং একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রজন্মকেও পুণ্যবান করে গড়ে তুলেন, যার ফলে ১২ প্রজন্ম পর্যন্ত লাগাতার তাঁদের মাঝে ১২ জন ইমাম জন্মগ্রহণ করেন।
(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ:১৮৭-১৮৮)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একস্থানে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, "হযরত আলী (রা.) যখন ঈমান আনেন তখন তিনি বালকই ছিলেন। তিনিও এ বিশ্বাস নিয়েই ঈমান এনেছিলেন যে, ইসলামের খাতিরে আমাকে সকল প্রকার বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে। বালক ছিলেন কিন্তু এই জ্ঞান ছিল যে, আমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে; এমনকি খোদা তা'লার রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা-ও দিতে হবে। হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) তাঁর নবুয়্যত লাভের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে সত্যর বাণী পৌঁছানোর জন্য একটি দাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা.)-এর অনেক আত্মীয়স্বজন এই দাওয়াত খেতে আসে। সবার খাওয়া শেষ হলে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে চাইলেন কিন্তু আবু লাহাব তাদের সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং লোকেরা তাঁর (সা.) কথা না শুনেই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়। এটি দেখে মহানবী (সা.) অবাক হন যে, এরা অদ্ভুত মানুষ! দাওয়াত খেয়েও কথা শোনে না। যাহোক, মহানবী (সা.) এর পরও আশা ছাড়েন নি বরং তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, পুনরায় তাদেরকে ডাকা হোক। অতএব পুনরায় সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাদেরপেটভরে খাওয়ার পর মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে বলেন, দেখুন! এটি আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ! তিনি তাঁর নবীকে আপনাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। আমি আপনাদেরকে খোদার দিকে আহ্বান করছি। আপনারা যদি আমার কথা মেনে নেন তাহলে আপনারা পারলৌকিক ও ইহজাগতিক কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হবেন। আপনাদের মাঝে এমন কেউ কি আছেন যিনি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবেন? একথা শোনার পর গোটা বৈঠকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘরের এক কোণ থেকে (তাদের মাঝে) সবচেয়ে দুর্বল এক বালক উঠে দাঁড়ায় আর সে বলে, যদিও আমি একজন অত্যন্ত দুর্বল মানুষ এবং বয়সের দিক থেকেও সবার চেয়ে ছোট তথাপি আমি আপনার সঙ্গ দিবো। এই বালকটি ছিলেন হযতর আলী (রা.) যিনি তখন ইসলামের সমর্থনের ঘোষণা দেন। (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪-২৫)

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.) যে ত্যাগস্বীকার করেছেন সে ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, মক্কাবাসী পরস্পর পরামর্শ করে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে হানা দিয়ে যখন তাঁকে বন্দী বা হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটে তখন ওহীর মাধ্যমে তিনি (সা.) শত্রুদের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত হন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করার পর তিনি (সা.) হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং হযরত আলী (রা.) কে সেই রাতে মহানবী (সা.)-এর বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর লাল রং-এর সেই হাযরামী চাদরাবৃত হয়ে রাত অতিবাহিত করেন, যেটি গায়ে চড়িয়ে তিনি (সা.) ঘুমাতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

মুশরেকদের যে দল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য ওঁত পেতে বসেছিল তারা প্রভাতে রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর গৃহে প্রবেশ করলে হযরত আলী (রা.) ঘুম থেকে উঠেন। কাছে আসার পর তারা হযরত আলী (রা.)কে চিনতে পারে এবং তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমার সাথি কোথায়? অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি জানি না; আমি কি তার পাহারাদার? তোমরা তাঁকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলে, তাই তিনি চলে গেছেন। মুশরেকরা তাকে বকাঝকা ও প্রহার করে এবং ধরে কাবা গৃহে নিয়ে যায় আর সেখানে কিছুক্ষণ আটকে রেখে ছেড়ে দেয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬)

এরপর আরেকটি সীরাত গ্রন্থে লেখা আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে মক্কাবাসীর আমানত ফিরিয়ে দিয়ে ৩ দিন পর হযরত আলী (রা.) হিজরত করে নবী করীম (সা.)-এর নিকট পৌঁছেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে ক্বাবায় উম্মে কুলসুম বিন হিদমের বাড়ি অবস্থান গ্রহণ করেন।

(সীরাতুন নবুয়্যাহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২৪৮)

হিজরতের সময় যে ঘটনা ঘটেছে সীরাতে খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে সেটির উল্লেখ এভাবে হয়েছে যে,অন্ধকার রাত ছিল আর বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত যালেম কুরাইশরা তাদের কৌতুহল নিয়ে মহানবী (সা.)-এর বাড়ির চার পাশে অবস্থান নিয়ে বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তারা প্রভাত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল যে, মহানবী (সা.)-নিজ গৃহ থেকে বের হলেই তারা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করবে। মহানবী (সা.)-এর নিকট অনেক কাফেরের আমানত গচ্ছিত ছিল। প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে অধিকাংশ লোক তাদের আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। কাজেই মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে এসব আমানতের হিসাবনিকাশ বুঝিয়ে দেন এবং জোরালো নির্দেশ প্রদান করে বলেন, আমানত ফেরত না দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে না। এরপর মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড় আর তাকে আশ্বস্ত করেন যে, আল্লাহর কৃপায় তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি শুয়ে পড়েন আর মহানবী (সা.) তাঁর লাল চাদরটি তার ওপর দিয়ে দেন। এরপর তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন অবরোধকারীরা তাঁর দরজার সামনেই উপস্থিত ছিল কিন্তু যেহেতু ধারণাই ছিল না যে, মহানবী (সা.) রাতের প্রথম প্রহরেই এভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বেন। তারা তখন এতটা উদাসীনতার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল যে, মহানবী (সা.) তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়ে চলে যান কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। মহানবী (সা.) নীরবে কিন্তু দ্রুত মক্কার অলি গলি অতিক্রম করছিলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জনবসতি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং সওর গুহার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে পূর্বেই সববিষয় নির্ধারিত ছিল। পথিমধ্যে তিনি (রা.)ও তাঁর সাথে যোগ দেন। এই ঘটনার কারণেই সওর গুহা ইসলামের একটি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। মক্কার দক্ষিণে অর্থাৎ মদিনার বিপরীত দিকে ৩ মাইল দুরত্বে অবস্থিত এক রুক্ষ ও জনমানবহীন পাহাড়ের অনেক উঁচু একটি স্থানে অবস্থিত এক গুহা। এতে পৌঁছার পথও অত্যন্ত দুষ্কর। (এটি মদীনার দিকে নয় বরং এর উল্টো দিকে অবস্থিত।) সেখানে পৌঁছার পর প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) গুহার ভিতরে প্রবেশ করে জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন আর এরপর মহানবী (সা.)ও ভিতরে প্রবেশ করেন। অপরদিকে যেসব কুরাইশ মহানবী (সা.)-এর গৃহ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তারা একটু পর পরই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখতো আর হযরত আলী (রা.) কে তাঁর জায়গায় শায়িত দেখে তারা আশ্বস্ত হতো। কিন্তু সকালে তারা বুঝতে পারে তাদের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন তারা এদিক সেদিক ছুটতে থাকে। মক্কার অলিগলিতে সাহাবীদের বাড়িঘরে তারা তল্লাশি চালায় কিন্তু তাঁর (সা.) কোন সন্ধান পায় না। এই ক্ষোভে তারা হযরত আলী (রা.) কে ধরে নিয়ে গিয়ে সামান্য মারধর করে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৩৬-২৩৭)

হযরত আলী (রা.)-এর এই ত্যাগের উল্লেখ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এভাবে করেছেন যে, মহানবী (সা.) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় হযরত আলী (রা.) কে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন। তখন খাটের বা চারপায়ীর প্রচলন ছিল না, বরং এখনও মক্কাতে খাট ব্যবহারের প্রচলন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে ভুলে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তাকে নিজ খাটে শুইয়ে দেন। (তখন বিছানা বানানো হতো কিন্তু চৌকি বা খাট ছিল না) তাদের কেউ কেউ তাঁকে (সা.) দেখে ছিল কিন্তু তারা মনে করে, এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে, সম্ভবত তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসে থাকবে আর এখন ফিরে যাচ্ছে। এর মূল কারণ হলো, মহানবী (সা.) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বাইরে বের হয়েছিলেন এবং তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র ভীতিও ছিল না। তারা মনে করেছিল, তিনি (সা.) এত সাহসিকতার সাথে বাইরে বের হওয়ার সাহস কীভাবে করতে পারেন! নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে যে তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে থাকবে। এরপর তারা এটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দেয় যে , তিনি বের হয়ে চলে যান নি তো আবার? তারা এক ব্যক্তিকে শুয়ে থাকতে দেখে এবং মনে করে, ইনিই মহানবী (সা.)। মোটকথা, সারা রাত ধরে তারা তাঁর (সা.) বাড়ি পাহারা দিতে থাকে। এরপর সময় সঠিক মনে করে তারা ভিতরে প্রবেশ করে। সম্ভবত দেহ দেখে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, এ দেহ মহানবী (সা.)-এর নয়। তারা মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখে অথবা মুখ খোলা ছিল হয়তো, যাহোক তারা বুঝতে পারে যে, শায়িত ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) রসূলে করীম (সা.) নন। তখন তারা বুঝতে পারে, মহানবী (সা.) নিরাপদে চলে গেছেন এবং তাদের জন্য এখন ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫১০)

অন্য এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী (রা.) কে এই মহান ত্যাগস্বীকারের সৌভাগ্য দান করেছেন। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা নিজ গৃহ থেকে বের হতে চাইলেন তখন তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বললেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড় যেন কাফেররা উঁকি দিলে কোন ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে রয়েছে বলে চোখে পড়ে আর তারা যেন পিছু ধাওয়ার জন্য এদিক সেদিক বেরিয়ে না পড়ে। সেসময় হযরত আলী (রা.) এ কথা বলেন নি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বাড়ির চতুর্দিকে কুরায়েশদের বাছাই করা যুবকরা হাতে তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যদি সকালে জানতে পারে, আপনি বেরিয়ে গেছেন তখন তারা আমার ওপর আক্রমণ করে আমাকে হত্যা করবে। বরং হযরত আলী (রা.) প্রাশান্ত চিত্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং মহানবী (সা.) নিজের চাদর তার ওপর দিয়ে দেন। প্রভাতে কুরায়েশরা যখন দেখতে পায় হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবর্তে হযরত আলী (রা.) তাঁর বিছানা থেকে উঠেছেন তখন তারা নিজেদের ব্যর্থতায় দাঁত কামড়াতে থাকে এবং হযরত আলীকে (রা.) তারা মারধর করে। কিন্তু এতে কী যায় আসে। নিয়তির লেখা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিরাপদে মক্কা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী (রা.)-এর জানা ছিল না যে, এই ঈমানের পরিবর্তে তিনি কী লাভ করবেন! তবে আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, এ কুরবানীর বিনিময়ে শুধুমাত্র হযরত আলীই সম্মান লাভ করবে না বরং হযরত আলীর বংশধরও সম্মান পাবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি প্রথম যে অনুগ্রহ করেন তা হলো তাকে রসূলে করীম (সা.)-এর জামাতা হবার সৌভাগ্য দান করেন। তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় যে অনুগ্রহ করেন তা হলো নবী করীম (সা.)-এর হৃদয়ে তার জন্য এতো ভালবাসা সৃষ্টি করেন যে, তিনি (সা.) বহুবার তার প্রশংসা করেছেন।

(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫)

যাহোক আমি একই ঘটনাসংক্রান্ত উদ্ধৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছি। সেগুলোর মূল ঘটনার দিক থেকে একই বিষয়, কিন্তু আমি যে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি এর কারণ হলো এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে কিছুনতুন বিষয় জানা যায় অথবা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হলে তা সামনে চলে আসে কিংবা সেই সাহাবী যেমন এখানে হযরত আলীর (রা.) এর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সামনে এসেছে। প্রত্যেক সাহাবীর সাথে মহানবী (সা.)-এর যে সম্পর্ক ছিল তাও জানা যায়। কখনো মনে হয় একই উদ্ধৃতিই বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেক উদ্ধৃতির উপস্থাপনা ভিন্ন আঙ্গিকে হয়ে থাকে তাই উপস্থাপন করে থাকি। যাহোক হযরত আলীর (রা.) স্মৃতিচারণ চলমান রয়েছে অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির উল্লেখ করব যাদের জানাযা পড়াব। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম হলেন নানকানা জেলার মাঢবেলুচানের অধিবাসী তারেক মাহমুদ সাহেবের পুত্র শহীদ ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব। গত শুক্রবার ২০ নভেম্বর ২০২০ জুমুআর নামায পড়ার পর বিরোধীরা গুলি করে শহীদ করেছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিস্তারিত বর্ণনা অনুসারে শহীদ মরহুম নিজ পিতা তারেক মাহমুদ সাহেব এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ২০ নভেম্বর জুমুআর নামায পড়ার জন্য তার জ্যেঠা জনাব মু হাম্মদ নাফিস সাহেবের গৃহে একত্রিত হন। জুমুআর নামায পড়ার পর আনুমানিক বেলা আড়াইটায় নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হলে গলিতে পিস্তল নিয়ে অপেক্ষমান মেহেদ নামের ষোল বছরের এক যুবক তাদের ওপর গুলি চালায় আর এরফলে ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- শহীদ মরহুমের বয়স ছিল ৩১ বছর। এ আক্রমণে শহীদ মরহুমের পিতা তারেক মাহমুদ সাহেব মাথায় গুলি লাগার দরুণ গুরুতর আহত হন এবং এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার বয়স ৫৫ বছর, তিনি সেক্রেটারী মাল এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট। অপরদিকে শহীদ মরহুমের জ্যেঠা জামা'তের প্রেসিডেন্ট ৬০ বছর বয়স্ক জনাব সাঈদ আহমদ মকসুদ সাহেব এবং

খোদ্দামুল আহমদীয়া যয়ীম জনাব তৈয়্যব মাহমুদ সাহেব, তার বয়স ২৬ বছর, গুলি লাগার কারণে আহত হয়েছেন আর সাময়িকভাবে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।তারা যদিও নিরাপদ রয়েছেন কিন্তু শহীদ মরহুমের পিতা গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আক্রমণকারী দুই ম্যাগযিন গুলি বর্ষণ করে তৃতীয় ম্যাগযিন লোড করার সময় ধরা পড়ে। যাহোক এখন সেখানে তারা আমাদের শত্রুতাকে এক তারা নতুন রূপ দিয়েছে অর্থাৎ, স্বল্প বয়স্ক ছেলেদের প্ররোচিত করে এবং তাদের মাধ্যমে আক্রমণ করায়, যেন পরবর্তীতে আদালতে বলতে পারে যে, এ তো নাবালক, তাই তার শাস্তি কমানো হোক অথবা এমনিতেই শাস্তি মওকুফ করে দেওয়া হোক। অতএব তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে আবার বলে যে, আমাদের কোন অনুযোগ নেই এবং আমরা মোটেও কোন প্রকার কঠোরতা করছি না, আহমদীদের ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার করছি না; অথচ অপরদিকে শাহাদাতের ঘটনাও ঘটছে। আর কোন কোন সরকারী কর্মকর্তা জোরপূর্বক মামলাও করাচ্ছে। যাহোক আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি তাদের যেন বোধোদয় ঘটে, আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের পাকড়াও করুন।

মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের আসে তার দাদা মোকাররম হেকীম মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের মাধ্যমে, যিনি তার বংশের অন্যান্য সদস্যের সাথে ১৩ বছর বয়সে দ্বিতীয় খিলাফতকালে বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুম লাহোরের ইসলামীয়া কলেজ থেকে এফ.এস.সি (এইচ.এস.সি) পাশ করেন। এরপর ২০১৩ সনে রাশিয়ার মস্কো থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জন করেন। আজকাল পি.এম.সি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ফযলে উমর হাসপাতালেও কাজ করেছেন। শহীদ মরহুম বহু বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অসামান্য ভালোবাসা ছিল। জামা'তের কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় অতিথি দের অসাধারণ সম্মান করতেন। যখনই তাকে জামা'তের পক্ষ থেকে কোন কাজের জন্য বলা হতো তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যেতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। বহুবার রোগীদের তিনি নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। সর্বদা সেবার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতেন, অ-আহমদীদের সাথেও তার একই ব্যবহার ছিল। অ-আহমদী অনেক ভদ্রমানুষ এসে এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। এই পরিবারটি দীর্ঘকাল থেকে বিরোধিতাপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন । ১৯৭৪ সনেও বিরোধীরা শহীদ মরহুমের দাদার দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার পিতা তারেক মাহমুদ সাহেবকে ২০০৬ সনে বিরোধীরা নির্মম নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিল। কিছুদিন পূর্বে আহমদীয়াতের এক শত্রু বাজার অতিক্রমের সময় শহীদ মরহুমের পিতার ওপর থুতু ফেলেছিল। এরূপ আচরণ মানুষ তাদের সাথে স্থায়ীভাবে করে আসছিল যাহোক তারা সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

রাশিয়ার সেইন্ট পিটার্সবার্গ-এর মুবাল্লেগ সাদাকাত আহমদ সাহেব লিখেন, শিক্ষা জীবনের একটি বড় অংশ তিনি তাতারিস্তান এর কাযান-এ অতিবাহিত করেছেন এবং সফল ডাক্তার হয়ে পাকিস্তানে ফিরে যান। তিনি বলেন, ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব শিক্ষার্জনকালে জামা'তের সাথে একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। জুমুআর নামায ও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও সর্বদা নিয়মিত ছিলেন। এছাড়া তার হোস্টেল মিশন হাউস থেকে বেশ দূরে হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য জামা'তী অনুষ্ঠানেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন এবং সাগ্রহে অংশ নিতেন। তাকে মেডিকেলে তার গ্রুপের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের একজন গণ্য করা হতো। শিক্ষার মাধ্যম যদিও ইংরেজি ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিশ্রম এবং আগ্রহের ফলে তিনি রাশিয়ান ভাষায়ও বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছিলেন। কাযানে যে হোস্টেলে তিনি থাকতেন, সেখানে সবাইকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি আহমদী। আর এ কারণে তাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হতো, কেননা সেখানে পাকিস্তানী ছাত্ররাও ছিল, যারা জামা'তের কঠোর বিরোধিতা করত। কিন্তু তিনিও যখনই সুযোগ হতো তবলীগ করতেন। তিনি আরো লিখেন, আমি যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম তখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, মাড বালোচাঁ-য় তাদের অনেক বেশি বিরোধিতা হচ্ছে, তাই তিনি রাবওয়া স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা রাখতেন আর তিনি রাবওয়ার ঘরও নির্মাণ করেছেন।

ফরিদ আবরা গিমুফ কাযান তাতারিস্তান এর রাশিয়ান আহমদী, তিনি বলেন, মরহুম খুব দ্রুত রাশিয়ান ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। তিনি খুবই প্রসন্ন চিত্ত ও পুণ্য স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তার মৃদু-হাসি হতে নূর বিচ্ছুরিত হতো। মরহুমের ছেড়ে যাওয়া পরিবারের মাঝে পিতা জনাব তারেক মাহমুদ সাহেব ছাড়াও মা মোহতরমা শামীম আখতার সাহেবা রয়েছেন। জামানীতে রয়েছেন ভাই কাসেম মাহমুদ সাহেব এবং বোন ফায়েযা মাহমুদ সাহেবা যিনি নাসীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। জান্নাতুল ফেরদৌস-এ উন্নত মর্যাদা দান করুন। আহতদের সুস্থ্যতা দান করুন এবং পূর্ণ ও দ্রুত আরোগ্য দিন। সকল আহতকে সর্বপ্রকার জটিলতা থেকে রক্ষা করুন। তার অন্যান্য প্রিয়ভাজন ও আত্মীয়স্বজনদেরও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় ভূষিত করুন।

পরবর্তী জানাযা সিয়েরা লিওনের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জামাল উদ্দিন মাহমুদ সাহেবের। তিনি গত ০৩ নভেম্বর তারিখে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- মরহুম গত ১৬ বছর থেকে জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। মিশনারী ইনচার্জ জনাব সাঈদুর রহমান সাহেব লিখেন, তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একটি বিশেষ গুণ এটিও ছিল যে, পুরো বিশ্বের আহমদীদের জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত করে এক পরিবারভুক্ত করার তিনি বাস্তব উদাহরণ ছিলেন। অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন। প্রায় ২ হাজার লোক মরহুমের জানাযার নামায ও দাফনকাফনে অংশ নিয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ২ জন সরকারী মন্ত্রী, সিয়েরা লিওনের চীফ অফ আর্মি স্টাফ, বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য ও প্যারামাউন্ট চীফসহ অসংখ্য সরকারি উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

নুসরত জাহান স্কীমের সেক্রেটারী মুবারক তাহের সাহেব লিখেন, মরহুম অনেক নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ এবং মনে প্রাণে জামা'তের সেবক ছিলেন। দীর্ঘকাল থেকে তিনি জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়ে আসছিলেন, সেইসাথে 'আহমদীয়া প্রিন্টিং প্রেস সিয়েরালিওন'-এর সহকারী ম্যানেজারও ছিলেন। মরহুম ঘানার অধিবাসী ছিলেন। তার পিতা মুকাররম ইব্রাহীম কোজো মাহমুদ সাহেবকে হযরত মওলানা নযীর আহমদ মুবাশ্বের সাহেব শিক্ষা বিভাগের কাজের জন্য সিয়েরালিওন প্রেরণ করেছিলেন। মুবারক তাহের সাহেব আরো লিখেন, তেরো বছর পর্যন্ত জামাল সাহেব আমার নিকট রুকুপুরে ছিলেন। তার পিতা তাকে শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে তার নিকট রেখেছিলেন। তিনি শুরু থেকেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাজামা'ত নামায এবং জামা'তী অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। রুকুপুরের খোদ্দামদের সাথে তবলীগ এবং ধর্মপ্রচারের কাজ করতেন।

রকীম প্রেস, সিয়েরা লিওন-এর ইনচার্জ উসমান তালে সাহেব বলেন, জামাল উদ্দীন মাহমুদ সাহেব খাকসারের পূর্বে দীর্ঘদিন থেকে সেখানে সেবা করে আসছিলেন, তিনিই সেখানকার ইনচার্জ ছিলেন। খাকসার তার সাথে বারো বছর কাটিয়েছি। এই সময়কালে তিনি কখনো এটি প্রকাশ করেন নি যে, খাকসার তার চেয়ে বয়সে ছোট এবং অনভিজ্ঞ, বরং সর্বদা সম্মানপূর্ণ আচরণ করতেন এবং বলতেন যে, আপনি মুবাল্লেগ এবং খলীফাতুল মসীহ্ আপনাকে নিযুক্ত করেছেন। কখনো কোন বিষয়ে এমন হয় নি যে, তিনি খাকসারের আনুগত্য করেন নি। আনুগত্য এবং বিনয় তার মাঝে এত বেশি ছিল যে, তাকে কখনো কোন কাজ করতে বললে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই কাজ আরম্ভ করে দিতেন এবং সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে তা সম্পন্ন করতেন। তিনি বলেন, খাকসার এই সময়কালে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। মরহুম বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। বাজামা'ত নামাযের প্রতি অনেক যত্নবান ছিলেন। এছাড়া তার নামাযের সৌন্দর্যও ছিল ঈর্ষণীয়। সর্বদা একান্ত বিনয় ও বিগলন এবং প্রশান্ত চিত্তে নামায পড়তেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল এবং প্রতিটি জুমু'আর খুতবা খুবই সম্মানজনকভাবে বসে শুনতেন। অতঃপর তিনি আরো লিখেন, জামাল সাহেব সিয়েরা লিওন এর রীতি অনুযায়ী বহু শিশুকে নিজের বাসায় রাখেন এবং স্বীয় খরচে তাদেরকে পড়ালেখা করান। তাদের মাঝে অনেকেই এখন ভালো চাকরি করছে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে তাকে স্মরণ করে।

মুরব্বী নাভিদ কুমর সাহেব লিখেন, মরহুম জামা'তী তাহরীকসমূহে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। নিজ পিতামাতা ও বংশের অন্যান্য বুযুর্গদের নামে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ খাতে অতিরিক্ত কুরবানী করতেন। যখনই তার পৈত্রিক গ্রাম রুকুপুরে আসতেন, ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময়মতো মসজিদে উপস্থিত হতেন। সাধারণত মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে লোকজনকে জামা'তী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং বিশেষত আহমদীয়া খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এর সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বোঝাতেন। সবার সাথে তার ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার মৃত্যুর সংবাদে আহমদী অ-আহমদী সবার চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। এ কারণেই তার জানাযায় বহু সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং আশপাশের এলাকা ছাড়া দীর্ঘ সফর করেও লোকজন (জানাযায়) অংশগ্রহণের জন্য আসে।

মরহুমের দুই জন স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু সন্তান-সন্ততি তার ঘরেই ছিল, যার গর্ভে দুই কন্যা ও দুই পুত্রের জন্ম হয়। এক মেয়ের বিবাহ হয়েছে, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় আছেন। বাকিদের মাঝে দুইজন ঘানায় পড়াশোনা করছে আর একজন সিয়েরালিওনে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তার

কোন সন্তান নেই। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্ম সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী জানাযা আমাতুস্ সালাম সাহেবার, (যিনি) সাবেক নাযেম জায়েদাদ ও রাবওয়ার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা মরহুম মোকাররম চৌধুরী সালাহ উদ্দিন সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ১৯ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার স্বামী চৌধুরী সালাহ্ উদ্দিন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং হযরত হামনা বিবি সাহেবার পৌত্র ছিলেন। তার দাদা ও দাদী উভয়ে সাহাবী ছিলেন। তার ছেলে নঈম উদ্দিন সাহেব তার মা সম্পর্কে লিখেন যে, যেসব বিষয় আমার জীবনে অম্লান ছাপ রেখে গেছে সেগুলোর মাঝে একটি হলো, মায়ের আমাদের নামাযের প্রতি খেয়াল রাখা। এটি তার সবচেয়ে দৃঢ় কর্মপন্থা ছিল, অত্যন্ত কঠোরভাবে তিনি তা পালন করাতেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি খুবই অনড় ছিলেন। আমাদের ঘর কার্যত হোস্টেল এর ন্যায় ছিল। আমাদের বহু সংখ্যক আত্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের বাসায় অবস্থান করতেন এবং তাদের অবস্থান কয়েক বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মরহুমা মা এই বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাক্তির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন যেন সকলই সর্বাবস্থায় নিয়মিত নামায পড়ে। সকল সন্তানকে নিজে কুরআন পড়াতেন। বড় সন্তানদের জন্য শিক্ষকও নিযুক্ত করতেন। তার দ্বিতীয় গুণ যা আমার জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে তা হলো, বাড়িতে অবস্থানরত সদস্যদের সম্ভাব্য সকল আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য তার চেষ্টারত থাকা। কোনদিন কাজের বুয়া ছুটি করলে তিনি সব শিশুর, অর্থাৎ নিজ সন্তানদেরও এবং অন্যদেরও কাপড় ধুয়ে দিতেন, কখনো লজ্জাবোধ করতেন না। আমাদের নানাবাড়ি ও দাদাবাড়ির লোকজনের প্রায় সময়ই রাবওয়ায় আসা-যাওয়া থাকতো। মরহুম বাবা অধিকাংশ সময় জামা'তের দায়িত্বের কারণে রাবওয়ায় থাকতেন না। মা সব মেহমানের আতিথেয়তা করতেন, এক্ষেত্রে কোন ত্রুটি রাখতেন না। আমি যেহেতু বড় ছেলে ছিলাম, তাই আমার চাইতেন যেন আমি যথাযথভাবে মেহমানদের আতিথেয়তা করি এবং কোন ঘাটতি যেন না থাকে। এরপর তিনি বলেন, আমাদের বড় দাদী, দাদী এবং নানী অধিকাংশ সময় দীর্ঘদিন আমাদের বাড়িতে থাকতেন আর আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরাও ছয় ভাইবোন। এছাড়া বংশের বহু সংখ্যক ছেলে-মেয়ে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়িতে অবস্থান করত, কিন্তু এসব পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি বছরের পর বছর পরম আন্তরিকতার সাথে উক্ত তিনজন বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর সেবা করে গেছেন। বার্ষিক জলসার সময় কম করে হলেও আশি-নব্বই জন অতিথি আসতেন। তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য বাড়ির (বাইরে) তাঁবু খাটানো হতো। বিছানাপত্রের জোগাড় হতো গ্রাম থেকে। (আমাদের) পিতামাতা উভয়ে মিলে পুরো আয়োজন পরম ভালোবাসা আর উদারমনে ও সানন্দে করতেন। বিনা ব্যতিক্রমে সকল আত্মীয়-স্বজন তার ভালোবাসা ও অতিথিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

তার এক ভাগ্নে লিখেছেন, আমি তার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছি, এমন কখনো হয় নি যে, সকালের বাসি রুটি তিনি আমাদের সন্ধ্যেবেলা দিয়েছেন অথবা রাতের বানানো রুটি সকালে খাইয়েছেন, বরং নাস্তায় সর্বদা গরম পরোটা এবং টাটকা দই দিতেন। অন্যের সন্তানদের অর্থাৎ, নিজের আত্মীয়-স্বজনের সন্তান যারা (তার বাড়িতে থেকে) পড়াশোনা করছিল তাদের প্রতি এতটাই যত্নবান ছিলেন অথচ নিজের সন্তানাদিও যথেষ্ট ছিল। জামাতের খলীফাদের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক আদর্শ স্থানীয় ছিল। এরপর তিনি আরো বলেন, এসব সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের প্রেরণা আমা দের শিরা-উপশিরায় ধাবমান ।

তার পুত্রবধূ নাবীলা নঈম সাহেবা বলেন, মরহুমা অনেক গুণের আধার ছিলেন। নামাযের প্রতি যত্নবান ছিলেন, পবিত্র কুরআন পাঠকারিনী, তাহাজ্জুদ গুযার, অত্যন্ত ধৈর্যশীলা এবং কৃতজ্ঞ নারী ছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতেও কখনো কোন অনুযোগ-অভিযোগ করতেন না। খোদা তা'লার ইচ্ছায় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতেন। দরিদ্রের লালকারিণী ছিলেন। কারো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। সদা তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। মরহুমা খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে সদা অগ্রগামিনী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও এসব গুণাবলী ধারণ করার তৌফিক দিন। মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো, ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মনসূর বুশরা সাহেবার, যিনি গত ০৬ নভেম্বর তারিখে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের সন্তান ছিলেন। হযরত মুনশী ফাইয়ায আলী কপুরথলভী সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী এবং হযরত শেখ আব্দুর রশীদ সাহেব (রা.)-এর পৌত্রী ছিলেন। তারা উভয়ে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] সাহাবী ছিলেন। শৈশবে হযরত আম্মাজান (রা.)-এর সাথে মরহুমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। মরহুমা স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্তিম সময় পর্যন্ত কখনো নামায পড়তে ভুলেন নি। এম.টি.এ.-তে নিয়মিত জুমুআর খুতবা শুনতেন। একজন পুণ্যবতী, বিশ্বস্ত ও পুণ্যবতী নারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, মরহুমা ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেবের মাতা ছিলেন। সম্প্রতি কুরাইশী সাহেব এবং তার স্ত্রী শওকত গওহর সাহেবাও ইন্তেকাল করেন। তারা অর্থাৎ, ডাক্তার সাহেব এবং তার স্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, মরহুমার অনেক সেবাযত্ন করেছেন। যাহোক, মায়ের জীবদ্দশায়ই তারা উভয়ে ইন্তেকাল করেছিলেন। মরহুমার পৌত্রী ইসমত মির্যা লিখেন যে, আমার দাদী সত্যিকার মু'মিনা এবং আহমদীয়াত ও খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক নারী ছিলেন। আমি তার চেয়ে বেশি ইবাদতকারিণী এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা পোষণকারী কাউকে দেখিনি। শান্ত প্রকৃতি ও সাদাসিধে স্বভাবের ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। জুমুআর নামাযের পর আমি উক্ত সব প্রয়াতের গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

২য় খুতবার শেষাংশ.....

সামার আহমদ ক্বমর-এর বড় বোন সামরিন বলেন, মাশাআল্লাহ্ আমার ভাই খুবই ভালো ছিল, সে কখনো রাগ করত না আর আমি কখনো তাকে বকাঝকা করলেও সে রাগান্বিত হতো না এবং অসন্তুষ্টও হতো না, বরং শিশুদের সাথেও ভাইবোনদের সাথে খুবই আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। বাকি ছোট ভাইবোনেরাও এমনটাই লিখেছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং পুরো পরিবার, ছোট ছেলেমেয়েদেরএবং তাদের পিতাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয়া সাঈদা আফযাল খোখার সাহেবার। তিনি শহীদ মুহাম্মদ আফযাল খোখার সাহেবের স্ত্রী এবং শহীদ আশরাফ মাহমুদ খোখার সাহেবের মাতা। তার স্বামীও শহীদ হয়েছিলেন এবং পুত্রও শহীদ হন। তিনি ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কানাডাতে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

স্বামী এবং পুত্রের শাহাদাতের পর তাঁকে একান্ত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য এবং সাহসিকতার সাথে সকলকঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে জীবন কাটিয়েছেন। কখনো কোন অভিযোগ মুখে আনতেন না। তিন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর আরেকজন যুবক ছেলে আসিফ মাহমুদ খোখারের আকস্মিক বিয়োগ বেদনাও তাকে সইতে হয়। তখনও তিনি পরম সহনশীলতা প্রদর্শন করেন এবং ধৈর্যশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নিজের সকল আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। অতিথিপরায়ণ ও গরিব-দুঃখীদের লালনকারীনি ছিলেন। খিলাফতের সাথে ভক্তি, সম্মান এবং ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। জামা'তের বিভিন্ন তাহ্‌রীকে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আজীবন তার পিতামাতা, শহীদ স্বামী, নিজ পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্য বুযূর্গের নামে দানখয়রাত করেছেন। তার পিতা জনাব মির্যা ফযল করীম সাহেব এবং মাতা সুগরা বেগম সাহেবা ছিলেন ইসলাম এবং আহমদীয়াতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পূর্ব লণ্ডনের মোহতরম মির্যা মুজীব আহমদ সাহেব এবং মির্যা ফজলুর রহমান সাহেবের সবচেয়ে বড় বোন ছিলেন। তিনি লাহোরের মুবারক খোখার সাহেবের বড় ভাবি এবং মুবারক সিদ্দিকী সাহেবের বড় খালা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তিনি তার পশ্চাতে এক পুত্র জনাব বেলাল আহমদ খোখার সাহেব এবং তিন কন্যা তৈয়্যবা কুরায়শী, তাহেরা মাজেদ এবং সামীনা খোখার-কে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন আর সন্তানদেরও তাদের মায়ের পুণ্যকর্ম সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান

(১ম পাতার শেষাংশ ...)

তিনি সংকল্প করেন যে, যেভাবেই হোক, তিনি ধর্মের সেবা করবেন, জগতের কোন কাজ করবেন না । তাঁর এক ভাইও মুসলমান হয়েছিল । তিনি যেহেতু ব্যবসা বাণিয্য ছেড়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বসে পড়েছিলেন, তাই কিছু সময়ের জন্য ঈমানের আবেগে নিজের ভাইকে খাবার পৌঁছে দিত । আরববাসীদের জীবনযাপনও ছিল অত্যন্ত সাদামাটা । তারা খেজুর খেয়ে পানি খেয়ে নিত আর এটিকেই তারা খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট মনে করত কিম্বা কখনও শুকনো মাংস পেলে তাই খেয়ে পানি খেয়ে নিত । মোট কথা তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর আর তাঁকে খাবার পৌঁছে দেওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল না । কিন্তু ঈমানের আবেগে কিছু কাল পর্যন্ত তাঁকে খাদ্য সরবরাহ করার পর হযরত আবু হুরাইরার ভাই বিরক্ত হয়ে ওঠে । (হযরত আবু হুরাইরাহ এক খৃষ্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁর মাও খৃষ্টান ছিলেন) যখন সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন একদিন রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর সমক্ষে এসে বলল, 'আপনি আবু হুরাইরাহকে বলুন, সে যেন উপার্জনও করে । সারা দিন মসজিদেই বা কেন বসে থাকে, কোনও কাজকর্ম কেন করে না! রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি কি জান যে, খোদা হয়তো তার সুবাদে তোমাকেও রিযক দান করছেন? হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) এই ঘটনাটিই আমার নানাজানকে শুনিয়েছিলেন । এরপর আমার নানাজান মরহুম জাগতিক শিক্ষার ইচ্ছা ত্যাগ করে তাকে এই কাজেই নিয়োজিত করেন । (তফসীর কবীর, ১০ম খ-, পৃ: ১১৬-১১৭)

জুমআর খুতবা

আমি তোমাদেরকে তার চেয়েও উত্তম জিনিসের কথা বলবো কি? আর তা হলো, তোমরা তোমাদের বিছানায় যাওয়ার পর ৩৪বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্ পড়বে। এটি তোমাদের জন্য কাজের লোকের চেয়েও শ্রেয়তর হবে।

হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.) নিজেদের অভাব-অনটন ও অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও জগৎবিমূখতা ও কৃচ্ছতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন।

আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদা, তাঁর জামাতা আবু তুরাব হযরত আল মুরতাজা (রা.)-এর জীবনালেখ্য

"হযরত আলী বলেন, 'যুদ্ধরত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর কথা আমার মনে পড়তো আর আমি তাঁর তাবুর দিকে ছুটে যেতাম। কিন্তু যখনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁকে সিজদায় আকুতি মিনতি রত পেয়েছি। আমি নিজ কানে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, "হে চীর স্থায়ী-চীরঞ্জীব খোদা, হে আমার খোদা! হে আমার জীবিত খোদা! হে আমার খোদা, জীবন দাতা খোদা!'

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৪ঠা ডিসেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৪ ফাতাহ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবা থেকে হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছে। আজও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। হযরত আলী (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আলীকে দু'বার নিজের ভাই আখ্যায়িত করেছেন। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাজেরদের মাঝে মক্কায় ভাই পেতে দেন। এরপর তিনি মুহাজের এবং আনসারদের মাঝে মদিনায় হিজরতের পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। দু'বারই হযরত আলীকে বলেন, 'আনতা আখী ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরা' অর্থাৎ তুমি ইহজগত ও পরকালে আমার ভাই।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৮)

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.)এবং হযরত সাহাল বিন হুনায়েফ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। *(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮)*

এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন কোন্ কোন্ সময় হয়েছে– সে সম্পর্কে ইতিহাসে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো, ভ্রাতৃত্ব দু'বার স্থাপিত হয়েছে। যেমন সহীহ্ বুখারীর একজন ব্যাখ্যাকারী আল্লামা কসতলানি বর্ণনা করেন যে, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দু'বার স্থাপিত হয়েছে। প্রথমবার হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুহাজেরদের মাঝে, যখন তিনি(সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের মাঝে, হযরত উসমান ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এর মাঝে, হযরত যুবায়ের ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-এর মাঝে আর হযরত আলী ও নিজের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। এরপর তিনি (সা.) যখন মদিনায় আসেন, তখন মুহাজের ও আনসারদের মাঝে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর ঘরে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) একশ সাহাবীর অর্থাৎ পঞ্চাশজন মুহাজের ও পঞ্চাশজন আনসারের মাঝে মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন।

(ইরশাদুস সারি শারাহ বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪১০)

হযরত আলী বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন; কেবল তাবুকের যুদ্ধ ব্যতিরেকে। তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.) তাকে স্বীয় পরিবার-পরিজনের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৯২)

হযরত সালেবা বিন আবু মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) সকল উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.)-এর পতাকা বহন করতেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের সময় হতো তখন হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) পতাকা নিয়ে নিতেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৩)

উশায়রা-র যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সমূহে এই যুদ্ধের নাম উশায়রা, যুল উশায়রা, যাতুল উশায়রা এবং উসায়রা'র যুদ্ধও বর্ণিত হয়েছে। উশায়রা একটি দুর্গের নাম, যা হেজায-এর ইয়াম্বু এবং যুল মারওয়া এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে মক্কার কুরাইশদের সম্পর্কে কোন সংবাদের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) মুহাজেরদের একটি দলসহ মদিনা থেকে বের হন এবং নিজের অবর্তমানে তাঁর দুধভাই আবু সালমাহ্ বিন আব্দুল আসাদকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। এই যুদ্ধে তিনি (সা.) চক্রাকারে কয়েক বার ঘুরে অবশেষে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ইয়াম্বু-র পার্শ্ববর্তী (এলাকা) উশায়রায় পৌঁছেন। যদিও কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ হয়নি কিন্তু এই সময় তিনি (সা.) বনু মুদলেজ গোত্রের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ফিরে আসেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩২৯) (লুগাতুল হাদীস-৩য় খণ্ড,পৃ: ১১০-১১১) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫) (আদদালায়েলুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬০)

হযরত আলী (রা.) এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বর্ণনা করেন যে, যাতুল উশায়রা-র যুদ্ধে হযরত আলী এবং আমি সফর-সঙ্গী ছিলাম। মহানবী (সা.) যখন সেই স্থানে পৌঁছেন এবং সেখানে যাত্রা বিরতি দেন তখন আমরা বনু মুদলেজ গোত্রের লোকদেরকে খেজুর-বাগানে তাদের একটি ঝরনার পাশে কর্মরত দেখতে পাই। হযরত আলী (রা.) আমাকে বলেন, হে আবু ইয়াকযান! তুমি কী বল– আমরা কি তাদের কাছে গিয়ে দেখব যে, তারা কি করছে? তাই আমরা তাদের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করি, এরপর আমাদের ঘুম পেলে আমি এবং হযরত আলী (রা.) সেখান থেকে বেরিয়ে খেজুরের বাগানে মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.) ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে জাগায়নি। তিনি (সা.) তাঁর পায়ের স্পর্শে আমাদেরকে জাগ্রত করেন, তখন আমাদের দেহ ধূলি মলিন ছিল। সেদিন মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর দেহে মাটি দেখে বলেছিলেন, হে আবু তুরাব! (অর্থাৎ, হে মাটির পিতা) আমি কি তোমাকে দু'জন চরম পাপিষ্ঠ সম্পর্কে বলব না? আবু তুরাবের কথা গত খুতবাতেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, (হযরত আলী) মসজিদে শায়িত ছিলেন, তার শরীরে মাটি লেগেছিল দেখে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, হে আবু তুরাব! অর্থাৎ আবু তুরাব নামে ডেকেছিলেন আর তখন থেকে এটি তার ডাক নাম হয়ে যায়। অথবা হতে পারে, তখন তিনি (সা.) তার এই ডাক নাম রাখেন বা পরবর্তীতে এই নামে সম্বোধন করে থাকবেন অথবা দু' স্থানেই বলে থাকবেন। মনে হয় এই নাম পূর্বেই রেখেছিলেন। যাহোক তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে দু'জন চরম দুর্ভাগা সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)। তিনি (সা.) বলেন, প্রথমজন হলো, সামূদ জাতির উহায়মার; যে হযরত সালেহ্ (আ.)-এর উষ্ট্রীর পা কেটে দিয়েছিল। আর দ্বিতীয়জন হলো, হে আলী সে, যে! তোমার মাথায় আঘাত করবে; ফলে তোমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬১)

সাফওয়ানের যুদ্ধ, বদরুল উলা, দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল আখের মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এভাবে লিখেছেন যে, উশায়রা-র যুদ্ধ শেষ হওয়া ও মহানবী (সা.)-এর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের দশদিন অতিবাহিত না হতেই কুরয্ বিন জাবের ফেহরী নামে মক্কার এক নেতা কুরাইশদের একটি সৈন্যদলের সাথে

চরম ধূর্ততার সাথে শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত মদিনার চারণভূমিতে অতর্কিতে হামলা করে আর মুসলমানদের উট ইত্যাদি লুটপাট করে নিয়ে যায়। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্র যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে তাঁর (সা.) অবর্তমানে আমীর নিযুক্ত করে মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন আর বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গা সাফওয়ান পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধকে বদরুল উলা'র যুদ্ধও বলা হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৩০)

এই যুদ্ধে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সাদা পতাকা দিয়েছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৩)

বদরের যুদ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরী মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, এতে হযরত আলী (রা.)-এর ভূমিকা সম্পর্কে যা জানা যায়, মহানবী (সা.) হযরত আলী, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত বাসবাস বিন আমর (রা.)-কে মুশরেকদের খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বদরের ঝরনার (কাছে) প্রেরণ করেন। তারা কুরাইশদেরকে তাদের গবাদিপশুকে পানি পান করাতে দেখেন আর তারা মুশরেকদের সেই দলটিকে ধরে মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ:২৫৬)

বদরের যুদ্ধের সময় যখন উভয় সেনাদল মুখোমুখি হয় তখন সর্বপ্রথম রবীআ'-র দুই পুত্র শায়বা, উতবা এবং ওয়ালীদ বিন উতবা এগিয়ে আসে এবং সম্মুখ সমরের আহ্বান জানায়। তখন বনু হারেস গোত্রের তিনজন আনসারী অর্থাৎ আফরা-র পুত্র মুআ'য, মুয়াওয়েয এবং অওফ, তাদের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যান; কিন্তু মুসলমান ও মুশরেকদের মধ্যেকার প্রথম যুদ্ধে আনসাররা যোগ দিক, মহানবী (সা.) তা চাইছিলেন না। বরং ইচ্ছে ছিল, তাঁর চাচার সন্তান এবং তাঁর স্বজাতির মাধ্যমে এই মহিমা প্রকাশিত হোক। তাঁর (সা.) নির্দেশে আনসারগণ সারিতে ফিরে আসেন এবং তিনি (সা.) তাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন। এরপর মুশরেকরা বলে, হে মুহাম্মদ! আমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে থেকে আমাদের সমপর্যায়ের লোক প্রেরণ কর। অতএব মহানবী (সা.) বলেন, হে বনু হাশেম! যখন তারা মিথ্যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করার জন্য এসেছে সেক্ষেত্রে তোমরা দণ্ডায়মান হও, তোমাদের অধিকারের জন্য যুদ্ধ কর, যার সাথে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের নবীকে প্রেরণ করেছেন। অতএব হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আলী বিন আবু তালেব এবং হযরত উবায়দা বিন হারেস দণ্ডায়মান হন এবং তাদের দিকে অগ্রসর হন। তখন উতবা বলে, কথা বল যেন আমরা তোমাদেরকে চিনতে পারি। তারা শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন, যে কারণে তাদের চেহারা ঢাকা ছিল। হযরত হামযা বলেন, আমি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সিংহ। এতে উতবা বলে, ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী আর আমি মিত্রদের সিংহ, তোমার সাথে এইদুজন কে? হযরত হামযা বলেন, আলী বিন আবু তালেব এবং উবায়দা বিন হারেস। উতবা বলে, উভয়েই ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী। উতবা তার ছেলেকে বলে, হে ওয়ালীদ ওঠ। অতএব হযরত আলী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে আসেন আর তাদের উভয়ের মাঝে তরবারির যুদ্ধ হয় এবং হযরত আলী তাকে হত্যা করেন। এরপর উতবা দণ্ডায়মান হয় এবং তার বিপরীতে হযরত হামযা এগিয়ে আসেন। তাদের উভয়ের মাঝে তরবারির যুদ্ধ হয় এবং হযরত হামযা তাকে হত্যা করেন। তারপর শায়বা দণ্ডায়মান হয় এবং তার মোকাবিলায় হযরত উবায়দা বিন হারেস এগিয়ে আসেন। হযরত উবায়দা সেদিন মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক ছিলেন। শায়বা হযরত উবায়দার পায়ে তরবারির প্রান্ত দিয়ে আঘাত করে যা তার পায়ের গোছায় লাগে এবং তা কেটে যায়। হযরত হামযা এবং হযরত আলী শায়বার ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ:২৫৭)

এই রেওয়ায়েতটি দুই বছর পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিছু অংশ আমি (পুনরায়) উল্লেখ করছি। অপর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে এর উল্লেখ এভাবে হয়েছে যে, হযরত আলী বর্ণনা করেন, উতবা বিন রাবিআ এবং তার সাথে তার পুত্র এবং ভাইও বের হয় এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে, আমাদের মোকাবিলায় কে অগ্রসর হবে? তখন আনসারদের বেশ কয়েকজন যুবক এর উত্তর দেয়। উতবা জিজ্ঞেস করে; তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা আনসার। উতবা বলে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন কাজ নেই, আমরা কেবল আমাদের চাচাতো ভাইদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে হামযা উঠ, হে আলী দণ্ডায়মান হও, হে উবায়দা বিন হারেস অগ্রসর হও। হযরত হামযা উতবার দিকে অগ্রসর হন এবং হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি শায়বার দিকে অগ্রসর হই আর উবায়দা এবং ওয়ালীদের মাঝে লড়াই হয় আর তারা একে অপরকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এরপর আমরা ওয়ালীদকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করি আর হযরত উবায়দা-কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৬৬৫)

হযরত আলী (রা.) বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, এই যুদ্ধে মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। মহানবী(সা.) সারা রাত খোদা তা'লার দরবারে বিনয়াবনত দোয়া ও আহাজারি করতে থাকেন। কাফেরবাহিনী যখন আমাদের নিকটবর্তী হয় আর আমরা তাদের সম্মুখে সারিতে অবস্থান নিই তখন হঠাৎ এক ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি পড়ে, যে লাল উটে আরোহিত ছিল আর মানুষের মাঝে তার বাহন হাঁটছিল। মহানবী (সা.) বলেন, হে আলী! কাফেরদের নিকট দণ্ডায়মান হামযাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর যে, লাল উটে আরোহিত ব্যক্তিটি কে আর সে কি বলছে? অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, তাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি তাদেরকে কল্যাণের কথা বলতে পারে তাহলে সে হচ্ছে সেই লাল উটে আরোহিত ব্যক্তি। ইতোমধ্যে হযরত হামযা (রা.)ও চলে আসেন। তিনি এসে বলেন যে, সেই ব্যক্তি হচ্ছে উতবা বিন রবীআ, যে কাফেরদের যুদ্ধ করতে বারণ করছে। তার কথার উত্তরে আবু জাহল তাকে বলে, 'তুমি একজন ভীতু আর যুদ্ধকে ভয় পাও।' উতবা উত্তেজিত হয়ে বলে, 'আজ দেখা যাবে কে ভীতু?'

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৮-৩৩৯)

যাহোক এরপর সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকরে।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের সময় আমার ও আবু বকর সম্পর্কে বলেন, তোমাদের উভয়ের মাঝে একজনের ডান পাশে হযরত জিবরাইল আছেন এবং অপরজনের ডান পাশে মিকাইল আছেন আর মহান এক ফিরিশতা হলেন হযরত ইস্‌রাফিল, যিনি যুদ্ধের সময় এসে উপস্থিত হন এবং সারিতে দণ্ডায়মান হন।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব বদরের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন, "হযরত আলী বলেন, 'যুদ্ধরত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর কথা আমার মনে পড়তো আর আমি তাঁর তাবুর দিকে ছুটে যেতাম। কিন্তু যখনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁকে সিজদায় আকুতি মিনতি রত পেয়েছি। আমি নিজ কানে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, "হে চীর স্থায়ী-চীরঞ্জীব খোদা, হে আমার খোদা! হে আমার জীবিত খোদা! হে আমার খোদা, জীবন দাতা খোদা!' হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়তেন আর কখনো কখনো অকৃত্রিম ভালবাসায় বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্ অবশ্যই নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। তাসত্ত্বেও মহানবী (সা.) অবিরাম দোয়ায় লেগে থাকেন আর এই জন্য শঙ্কিত ছিলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কখনো কখনো শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬১)

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে হযরত আলীর বিয়ে হয় দ্বিতীয় হিজরী সনে। হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে হযরত ফাতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং মহানবী (সা.) সানন্দে সম্মত হন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একে একে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর উভয়েই মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন কিন্তু মহানবী (সা.) নিশ্চুপ ছিলেন এবং তাদের কোন উত্তর দেন নি। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে হযরত ফাতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিই। তিনি (সা.)বলেন, তোমার কাছে মোহরানার জন্য কিছু আছে কী? আমি নিবেদন করি যে, আমার ঘোড়া এবং আমার বর্ম আছে। তিনি (সা.) বলেন, ঘোড়া তোমার নিজের কাছে থাকা আবশ্যক তবে তোমার বর্ম বিক্রি করে দাও। অতএব আমি আমার বর্ম চারশত আশি দিরহাম মূল্যে বিক্রি করে মোহরানার ব্যবস্থা করলাম। মানুষ বলে, দেনমোহর যা পার নির্ধারণ করে নাও, পরিশোধের কথা পরে দেখা যাবে। মহানবী (সা.) বলেন, প্রথমে দেনমোহরের ব্যবস্থা করো। এর অর্থ হলো, মোহরানা নারীর তাৎক্ষনিক প্রাপ্য। কেউ কেউ আমাকে লিখে দেয় যে, মহিলারা আমাদের কাছে দেনমোহর দাবি করছে অথচ আমরা তো সুখেই আছি। যদি তারা চায় তাহলে তাদের অধিকার হিসেবে তারা চায়, চাওয়া মাত্র তা পরিশোধ যোগ্য। পরে এটি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায় অথবা তালাক বা খোলার সময় এ বিষয়টি সামনে আসে, অথচ তালাক বা খোলার সাথে দেন-মোহরের কোন সম্পর্কই নেই।

যাহোক, অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে হযরত আলী (রা.) বর্ম বিক্রি করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) বর্মের যথার্থ মূল্য পরিশোধ করেন এবং বর্মও ফেরত দেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি সেই অর্থ নিয়ে আসি এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে তুলে দিই। তিনি (সা.) তা থেকে এক মুষ্টি পরিমাণ হযরত বেলালের হাতে দিয়ে বলেন, এ গুলো দিয়ে কিছু সুগন্ধি ক্রয় করে নিয়ে আসো আর কয়েকজনকে অদেশ

দেন যে, হযরত ফাতেমার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আয়োজন করো। অতএব হযরত ফাতেমার জন্য একটি খাট, চামড়ার একটি বালিশ প্রস্তুত করা হয় যা খেজুর গাছের ছাল-বাকল দিয়ে ভর্তি করা হয়। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক করার সময় তিনি (সা.) বলেন, আমার প্রভু আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কন্যা-বিদায়ের পর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বলেন, ফাতেমা! তোমার গৃহে প্রবেশ করার পর আমি আসার আগে পর্যন্ত তুমি কোন কথা বলবে না। অতএব হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর সাথে এসে ঘরের এক অংশে বসে পড়লেন; আর আমিও এক দিকে বসে পড়লাম। অতঃপর মহানবী (সা.) আসলেন এবং বললেন, এখানে আমার ভাই আছে কি? উম্মে আয়মান (রা.) বললেন, আপনার ভাই, যার কাছে আপনি আপনার মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন? তিনি (সা.) বললেন, হাঁ। তিনি (সা.) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত ফাতেমা (রা.) কে বললেন, আমার কাছে পানি নিয়ে আসো। (এমন আত্মীয়দের মাঝে বিবাহ হতে পারে কারণ তিনি সহোদর ভাই নন।) তিনি উঠে ঘরে রাখা পাত্রে পানি আনলেন। তিনি (সা.) পানির পাত্রটি নিলেন এবং তাতে কুলি করলেন; অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.) কে বললেন, এগিয়ে আস। তিনি এগিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তার ওপর এবং তার মাথার ওপর কিছু পানি ছিঁটালেন। তারপর দোয়া করলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তাকে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়াও। যখন তিনি ঘুরলেন তখন তিনি (সা.) তার কাঁধের মাঝখানে পানি ছিটালেন; হযরত আলী (রা.)-এর ক্ষেত্রেও এমনটিই করলেন। হযরত আলী (রা.)কে বললেন, আল্লাহ তা'লার নামে ও তাঁর আশিষ ধন্য হয়ে তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। অনুরুপভাবে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.) একটি পাত্রে ওযু করেন অতঃপর সেই পানি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রা.) ওপর ছিটিয়ে দেন; এবং দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ شَمْلِهِمَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! এদের উভয়কে আশিষমণ্ডিত কর এবং এদের উভয়ের মিলনকেও মধুময় কর। হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) আমাদেরকে হযরত ফাতেমাকে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে বা সাজানোর নির্দেশ দেন। সুতরাং আমরা বাড়ির প্রতি মনোযোগ দিলাম। আমরা বাতহা'র (মক্কার একটি উপত্যকা) নরম মাটি দিয়ে ঘর লেপলাম। এরপর খেজুরের আঁশ দিয়ে দুটি বালিশ বানালাম। আমরা নিজ হাতে তা ধুনেছিলাম। আমরা খাওয়ার জন্য খেজুর ও কিশমিশ এবং পানীয়জল রাখলাম। এবং ঘরের এক কোণে একটি কাঠ রাখলাম যেন তাতে কাপড়ও মশক ইত্যাদি ঝুলানো সম্ভব হয়। আমরা হযরত ফাতেমা (রা.) এর বিয়ের চেয়ে উত্তম কোন বিয়ে দেখি নি। খেজুর, যব, পনির এবং 'হ্যায়স' ছিল ওলীমার খাদ্য। 'হ্যায়স' সে খাবারকে বলে যা খেজুর এবং ঘি আর পনির ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বর্ণনা করেন, সে যুগে এই ওলীমার দাওয়াতের চেয়ে উত্তম কোন ওলীমা হয় নি।

(শারাহ আল্লামা যারকানি আলা মোয়াহেবুললুদানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৬৭) (সুনানা ইবনে মাজা, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-১৯১১)

হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আলীর (রা.) বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ সীরাতে খাতামান্নাবীঈন পু স্তকে এভাবে দেওয়া হয়েছে- "হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত খাদিজার (রা.) গর্ভে জন্ম নেওয়া মহানবী (সা.) এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তিনি (সা.) নিজ সন্তানদের মধ্য থেকে হযরত ফাতেমাকে (রা.) সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে তিনিই (রা.) সেই বিশেষ ভালবাসার সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন। তখন তার (রা.) বয়স ছিল প্রায় পনেরো এবং বিয়ের প্রস্তাব আসা আরম্ভ হয়ে যায়। সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমার (রা.) জন্য হযরত আবু বকর (রা.) আবেদন করলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) অপারগতা প্রকাশ করলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) নিবেদন করলেন, কিন্তু তার আবেদনও গ্রহণ করলেন না। এরপর এই দুই পুণ্যাত্মা মহানবী (সা.) এর ইচ্ছা হযরত আলীর অনুকূলে ভেবে হযরত আলীকে (রা.) আহ্বান জানান যে, তুমি ফাতেমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দাও। হযরত আলী (রা.) যিনি সম্ভবত পূর্ব থেকেই ইচ্ছা পোষণ করতেন কিন্তু লজ্জায় নীরব ছিলেন; তৎক্ষণাত মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন। অপরদিকে মহানবী (সা.) প্রতি ঐশী ওহীর মাধ্যমে এই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে, হযরত ফাতেমার (রা.) বিয়ে হযরত আলীর (রা.) সাথেই হওয়া উচিত। সুতরাং হযরত আলী (রা.) বিয়ের প্রস্তাব দেন আর মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি তো এ বিষয়ে পূর্বেই ঐশী ইঙ্গিত পেয়েছি।' এরপর তিনি (সা.) হযরত ফাতেমার মতামত জানতে চাইলে তিনি (রা.) লজ্জার কারণে মৌনতা অবলম্বন করেন; এটিও এক প্রকার সম্মতির লক্ষ্মণ ছিল। সুতরাং মহানবী (সা.) একদল মুহাজির ও আনসারকে সমবেত করে হযরত আলী ও ফাতেমার বিয়ে পড়ান; এটি ২য় হিজরির প্রথমদিকের বা মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। বদরের যুদ্ধের পর খুব সম্ভব ২য় হিজরির যুলহাজ্জ মাসে হযরত ফাতেমাকে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কাছে মোহরানায় দেওয়ার মত কিছু আছে কি?'

[আমি ঠিকই বলেছিলাম; ঐ বাগান-সংক্রান্ত ঘটনাটি, যা আগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা বিয়ের পূর্বেকার ঘটনা।] "মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কাছে মোহরানায় দেওয়ার মত কিছু আছে কি?' হযরত আলী নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার কাছে তো কিছুই নেই!' তিনি (সা.) বলেন, 'সেই বর্মটা কী করেছ যা আমি তোমাকে সেদিন (অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে) দিয়েছিলাম?' হযরত আলী নিবেদন করেন, 'সেটা তো আছে?' তিনি (সা.) বলেন, 'ঠিক আছে, সেটাই নিয়ে আস।' সুতরাং সেই বর্মটি চারশ' আশি দিরহাম মূল্যে বিক্রি করা হয় আর মহানবী (সা.) সেই অর্থ থেকে বিয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। বিয়েতে মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমাকে যেসব উপহার সামগ্রী দেন তার মধ্যে ছিল একটি নকশা করা চাদর, একটি চামড়ার গদি যা শুকনো খেজুরপাতা দিয়ে ভরা হয়েছিল, আর একটি মশক্; অপর একটি রেওয়াতে রয়েছে যে, তিনি (সা.) হযরত ফাতেমাকে উপহার সামগ্রী হিসেবে একটি জাঁতাও দিয়েছিলেন। যখন এই সব সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন ঘরের প্রশ্ন আসে। হযরত আলী এতদিন পর্যন্ত খুব সম্ভব মহানবী (সা.)-এর সাথে মসজিদ-সংলগ্ন কোন কামরায় থাকতেন, কিন্তু বিয়ের পর কোন পৃথক ঘরের প্রয়োজন ছিল যেখানে স্বামী- স্ত্রী থাকতে পারেন। তাই মহানবী (সা.) হযরত আলীকে নির্দেশ দেন, 'এখন তুমি কোন ঘর খোঁজ করো যেখানে তোমরা দু'জন থাকতে পার।' হযরত আলী সাময়িকভাবে একটি ঘরের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে হযরত ফাতেমাকে বিদায় দেওয়া হয়। সেদিনই রুখসাতানার পর মহানবী (সা.) তাদের ঘরে যান এবং কিছুটা পানি আনিয়ে তাতে দোয়া পড়েন এবং সেই পানি হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী-উভয়ের ওপরেই এই দোয়া পড়ে ছিটিয়ে দেন- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا نَسْلَهُمَا অর্থাৎ 'হে আমার আল্লাহ্, তুমি তাদের দু'জনের পারস্পরিক সম্পর্কে কল্যাণ দান কর, আর তাদের সেই সম্পর্কগুলো কল্যাণমণ্ডিত কর যা অন্যদের সাথে স্থাপিত হয়, আর তাদের বংশধরদের আশিষমণ্ডিত কর।' অতঃপর এই নবদম্পতিকে রেখে তিনি (সা.) চলে আসেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) ফাতেমার ঘরে আসেন, তখন হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁকে বলেন, হযরত হারেসা বিন নো'মান আনসারীর কয়েকটি ঘর আছে। আপনি তাকে যদি কোন একটি ঘর খালি করে দিতে বলেন তবে খুব ভাল হয়। মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের জন্য ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই এখন এটি বলতে আমার লজ্জা হয়। হযরত হারেসা (রা.) কোনভাবে এটি শুনতে পেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে ছুটে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যা কিছু আমার তা আপনারই। আল্লাহ্‌র কসম! আমার হাতে গচ্ছিত জিনিসের মাঝে সে জিনিস আমাকে বেশি আনন্দ দেয় যা অনুগ্রহপূর্বক আপনি গ্রহণ করেন। এরপর এই নিষ্ঠাবান সাহাবী অনেক পীড়াপীড়ি করে মহানবী (সা.) কে সম্মত করেন এবং একটি ঘরখালি করিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন এবং হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) সেখানে গিয়ে ওঠেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৫৫-৪৫৬)

হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.) নিজেদের অভাব-অনটন ও অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও জগৎবিমূখতা ও কৃচ্ছতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে, হযরত আলী (রা.) বলেন হযরত ফাতেমা (রা.) জাঁতা চালানোর ফলে হাতে কষ্ট হওয়ার অনুযোগ করেন। সেই সময় মহানবী (সা.)-এর কিছু বন্দীও হস্তগত হয়, হযরত ফাতেমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলেন কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তিনি অর্থাৎ হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে আসার কারণ সম্পর্কে অবগত করেন। মহানবী (সা.) যখন ফিরে আসেন তখন হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার আসার কথা মহানবীকে অবগত করেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন ততক্ষণে আমরা আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা দাঁড়াতে গেলে তিনি বলেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গাতেই থাক। এরপর তিনি আমাদের মাঝে বসে গেলেন, এমনকি আমার বুকে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি বলেন, তোমরা যা চেয়েছ আমি কি তোমাদের উভয়কে তার চেয়েও উত্তম কথা বলব না? তা হলো, তোমরা উভয়ে যখন বিছানায় যাবে তখন ৩৪বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্ পড়ো, এটি তোমাদের উভয়ের জন্য কোন সেবকের চেয়েও অধিকতর উত্তম হবে।

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, হযরত ফাতেমা সেবক বা কাজের লোক চাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং কাজ করতে কষ্ট হওয়ার কথা তুলে ধরেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা এভাবে কাজের লোক আমার কাছে পাবে না অর্থাৎ তিনি (সা.) দিতে চান নি যদিও গণিমতের মালে হযরত আলীরও অধিকার ছিল কিন্তু তিনি (সা.) দেন নি। তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলবো যা তোমার জন্য কাজের লোকের চেয়ে উত্তম হবে? তুমি বিছানায় যাবার পূর্বে ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়ো, এটি সহীহ মুসলিমের হাদীস। (সহী মুসলিম, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৯১৮, ৬৯১৫)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত বর্ণনা করতে গিয়ে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-প্রথমে বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেন। হাদীসটি হলো, হযরত ফাতেমা (রা.) অনুযোগ করেন যে, জাঁতা চালাতে তার কষ্ট হয়, তখন মহানবী (সা.)-এর কিছু ক্রীতদাস হস্তগত হয়েছিল। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলেন কিন্তু তাঁকে না পেয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-কে তার আসার কারণ সম্পর্কে অবগত করে ঘরে ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) ঘরে ফিরার পর যখন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে হযরত ফাতেমার আগমণ সম্পর্কে অবগত করেন তখন মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন, আমরা ততক্ষণে আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমি তাঁকে আসতে দেখে উঠতে চাইলাম কিন্তু মহানবী (সা.) বললেন, নিজ স্থানেই শুয়ে থাক। অতঃপর তিনি (সা.) আমাদের উভয়ের মাঝে বসে পড়েন এমনকি আমার বুকে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করতে থাকি। তিনি বসে যাওয়ার পর বলেন, তোমরা যে জিনিস চেয়েছ আমি তোমাদেরকে তার চেয়েও উত্তম জিনিসের কথা বলবো কি? আর তা হলো, তোমরা তোমাদের বিছানায় যাওয়ার পর ৩৪বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্ পড়বে। এটি তোমাদের জন্য কাজের লোকের চেয়েও শ্রেয়তর হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লেখেন, এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মহানবী (সা.) ধন-সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে এতটাই সতর্ক ছিলেন যে, হযরত ফাতেমার একজন সেবকের প্রয়োজন ছিল এবং জাঁতাকল চালানোর কারণে হাতে ব্যাথা হত কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সেবক দেন নি বরং তিনি তাকে দোয়া করতে বলেছেন এবং আল্লাহ তা'লার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি (সা.) যদি চাইতেন তাহলে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সেবক দিতে পারতেন কেননা, যে ধন-সম্পদ বণ্টনের জন্য এসেছে তা মহানবী (সা.)-এর কাছেই এসেছিল, আর এ গুলো সাহাবীদের মাঝে বণ্টনের জন্য আসতো। এতে হযরত আলীরও অংশ থাকতে পারতো আর ফাতেমাও এর অধিকার রাখতেন। কিন্তু মহানবী (সা.) সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং এসব সম্পদ হতে নিজ আত্মীয়- স্বজনদের দেওয়া পছন্দ করেন নি। কেননা আশঙ্কা ছিল, ভবিষ্যতে মানুষ এর ভুল ব্যাখ্যা করবে আর বাদশাহ প্রজাদের সম্পদকে নিজের জন্য বৈধ জ্ঞান করবে। সুতরাং তিনি (সা.) সাবধানতাবশত হযরত ফাতেমাকে সে সব দাস-দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে দেন নি, যারা তাঁর কাছে সে সময় বিতরণের জন্য এসেছিল। এখানে এটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এসব সম্পদে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের অংশ নির্ধারণ করেছেন। তিনি (সা.) তা থেকে খরচ করতেন এবং তার আত্মীয়- স্বজনকেও প্রদান করতেন। তবে কোন জিনিস তাঁর ভাগে না আসা পর্যন্ত তিনি মোটেই তা থেকে খরচ করতেন না এবং একান্ত নিকটাত্মীয়দেরও দিতেন না। জগদ্বাসী কি এমন কোন বাদশাহ্‌র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে যে এভাবে বায়তুল মালের সুরক্ষা করেছে? যদি কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তবে তা কেবল এই পবিত্র সত্তার অনুসারীদের মাঝেই পাওয়া সম্ভব অন্য কোন ধর্ম এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না।

(আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৪-৫৪৫)

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক রাতে মহানবী (সা.) তার এবং নিজ কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর নিকট আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা দু'জন কি নামায পড় না? আমি উত্তরে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে। তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো পছন্দ হলে জাগিয়ে দেন। মহানবী (সা.) প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে ফিরে যান। এখানে নামায বলতে তাহাজ্জুদের নামায বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময় যদি আমাদের ঘুম না ভাঙে, তবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আল্লাহ্ চাইলে আমাদের জাগিয়ে দেন আর তিনি জাগালে আমরা নামায আদায় করি। মহানবী (সা.) কোন কথা না বলে ফিরে যান। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি শুনতে পাই, তিনি তাঁর উরুতে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিলেন যে, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ সবচেয়ে বড় তর্কবাগীশ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এক রাতে তিনি (সা.) তার জামাতা হযরত আলী এবং কন্যা হযরত ফাতেমার ঘরে যান এবং বলেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ নামায পড়? অর্থাৎ সেই নামায যা মধ্যরাতের কাছাকাছি সময় উঠে পড়তে হয়? হযরত আলী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! (আমরা) পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু খোদা তা'লার ইচ্ছানুযায়ী কোন সময় আমাদের চোখ বন্ধ থাকলে তাহাজ্জুদ ছুটে যায়। তিনি (সা.) বলেন, তাহাজ্জুদ পড়বে এবং সেখান থেকে উঠে নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন আর যেতে যেতে বারবার বলছিলেন, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا এটি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত যার অর্থ হলো, মানুষ অধিকাংশ সময় নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না এবং বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দিয়ে নিজের দোষ গোপন করে। এ কথার অর্থ হলো, 'আমাদের কখনো কখনো ভুলও হয়ে যায়, হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা (রা.) এ কথা বলার পরিবর্তে তারা এটি কেন বললেন যে, খোদা তা'লা যদি চান যে আমরা জাগ্রত না হই, তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি আর এভাবে নিজেদের ভুলকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কেন তারা আরোপ করলেন?

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮৯-৩৯০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটিকে আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একবার যখন হযরত আলী মহানবীকে (সা.) এমন উত্তর দেন যাতে তর্ক-বিতর্কের দিকটি প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে এমন এক সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করেন যে, হযরত আলী হয়ত নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর স্বাদ উপভোগ করে থাকবেন। তিনি যে প্রশান্তি লাভ করে থাকবেন, তা তারই প্রাপ্য ছিল। আজও মহানবী (সা.)-এর এই অসন্তোষ প্রকাশের বিষয়টি অবগত হয়ে প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী দৃষ্টি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এক রাতে আমার ও ফাতেমাতুয্‌যাহরার কাছে আসেন, যিনি তাঁর(সা.)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ নামায পড় না? আমি উত্তরে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্ তা'লার হাতে। যখন তিনি জাগাতে চান জাগিয়ে দেন। একথা শুনে তিনি (সা.) ফিরে যান এবং আমাকে কিছুই বলেন নি। তিনি পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অতঃপর আমি শুনতে পাই যে স্বীয় উরুতে হাত চাপড়ে তিনি বলছিলেন, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিতর্ক করা আরম্ভ করে। সুবহানআল্লাহ্! কত চমৎকারভাবে তিনি হযরত আলীকে বুঝিয়েছেন যে, তার এরূপ উত্তর দেওয়া উচিৎ হয় নি। অন্য কেউ হলে হয় তর্ক করা আরম্ভ করে দিত যে, আমার অবস্থান ও মর্যাদার প্রতি তাকাও আর এরপর তোমার উত্তরের প্রতি লক্ষ্য কর। এভাবে আমার কথা প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার কি তোমার ছিল? এরূপ না হলেও কমপক্ষে এ বিতর্ক আরম্ভ করে বলতো, তোমার এই দাবি ভুল যে, মানুষ বাধ্য এবং তার সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'লার নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যেভাবে চান সেভাবেই করান! তিনি চাইলে নামাযের সামর্থ দান করেন আর চাইলে দান করেন না। আরো বলতেন, বলপ্রয়োগের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। কিন্তু তিনি এ দু'টি পন্থার কোনটিই অবলম্বন করেন নি। তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি এবং বিতর্ক করে হযরত আলীকে তার কথার ভুলও ধরিয়ে দেন নি। বরং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তার এ উত্তরে এভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, মানুষ বড়ই অদ্ভুত! সকল বিষয়েই নিজের মতামতের পক্ষে কোন না কোন যুক্তি দাঁড় করায় এবং তর্ক আরম্ভ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (স.)-এর এতটুকু বলার মাঝে এমন সব কল্যাণ নিহিত ছিল যার এক-দশমাংশও অন্য কারো শত তর্কে বা বিতণ্ডায় লাভ হওয়া সম্ভব ছিলনা।

এ হাদীস থেকে আমরা অনেক গুলো বিষয় জানতে পারি, যার কল্যাণে মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর আলোকপাত হয় এবং এখানে এর উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রথমত এটি জানা যায় যে, ধর্মানুবর্তিতার প্রতি তিনি (সা.) কতটা যত্নবান ছিলেন। তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে তার নিকটজনদের ওপর দৃষ্টি রাখতেন। অনেক লোক আছে যারা নিজেরা পুণ্যবান হয়ে থাকে এবং মানুষকেও পুণ্যের শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু তাদের নিজ পরিবারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে থাকে। তাদের মাঝে নিজ পরিবারের সদস্যদেরও সংশোধন করার বৈশিষ্ট থাকে না। এমন লোকদের সম্পর্কেই এ প্রবাদ প্রসিদ্ধ যে, প্রদীপের নীচে অন্ধকার। অর্থাৎ যেভাবে প্রদীপ তার চারপাশের সব জিনিসকে আলোকিত করে, কিন্তু স্বয়ং তার নীচেই অন্ধকার থাকে, অনুরূপভাবে এরাও অন্যদের নসীহত করে বেড়ায় ঠিকই, কিন্তু নিজেদের ঘর বা পরিবারের প্রতি দৃষ্টি দেয় না যে, আমাদের আলো দ্বারা আমাদের নিজেদের ঘরের লোকেরা কতটা উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু বোঝা যায়,মহানবী (সা.)-এ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন যে, তাঁর প্রিয়রাও যেন সেই আলোয় আলোকিত হয় যার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে আলোকিত করতে চাইতেন আর এ বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। তিনি নিয়মিত তাদের পরীক্ষা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 14 Jan, 2021 Issue No.2

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করতেন ও ক্ষতিয়ে দেখতেন। প্রিয়জন বা পরিবার পরিজনের তরবিয়ত করা এমন একটি উন্নত পর্যায়ের গুণ, যা তাঁর মাঝে না থাকলে তাঁর চরিত্রে অতিমূল্যবান একটি জিনিসের ঘাটতি থেকে যেতো। দ্বিতীয়ত এটি জানা যায় যে, সেই শিক্ষার প্রতি তাঁর (সা.) পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যা তিনি পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করতেন। এক মিনিটের জন্যও তিনি এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন না। মানুষ যেমনটি আপত্তি করে যে, নাউযুবিল্লাহ্, জগদ্বাসীকে বোকা বানানোর জন্য এবং নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এসবের বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাঁর কাছে কোন ওহী আসতো না! বিষয় এমন নয়, বরং নিজের রসূল এবং প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার বিষয়ে তাঁর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কথার কথা বলা যায় যে, হতে পারে, মানুষের কাছে তিনি কৃত্রিমভাবে নিজের সত্যতা প্রমাণ করতেন। কিন্তু এটা ভাবাও যায় না যে, রাতের বেলা এক ব্যক্তি বিশেষভাবে তার কন্যা ও জামাতার কাছে যাবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা সেই ইবাদত করে কিনা যা তিনি ফরয করেন নি, বরং তা আদায় করা মু'মিনদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন আর যা মাঝরাতে উঠে পড়া হয়। সেই সময় তাঁর যাওয়া এবং নিজ কন্যা ও জামাতাকে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে অনুপ্রাণিত করা সেই কামেল বা পরিপূর্ণ বিশ্বাসেরই প্রমাণ বহন করে যা সেই শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল, যার ওপর তিনি মানুষকে পরিচালিত করতে চাইতেন। অন্যথায় এক মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, যে জানে যে, একটি শিক্ষার অনুসরণ করা বা না করা সমান, সে তার সন্তান-সন্ততিকে এমন অসময়ে সেই শিক্ষা অনুসরণের উপদেশ দিতে পারে না। এটি তখনই হওয়া সম্ভব যখন এক ব্যক্তির হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, সেই শিক্ষার অনুসরণ করা ব্যতীত উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না। তৃতীয় বিষয় সেটি যা প্রমাণের জন্য আমি এই ঘটনার উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ মহানবী (সা.) প্রতিটি বিষয় বুঝানোর জন্য ধৈর্যের পন্থা অবলম্বন করতেন এবং বাগবিতণ্ডার পরিবর্তে প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে কাউকে তার ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবগত করতেন। যেমন এখানে হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর প্রশ্ন এভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন যে, আমরা ঘুমিয়ে গেলে আমাদের কী সাধ্য আছে যে, আমরা জাগ্রত হব? কেননা ঘুমন্ত মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না, ঘুমিয়ে গেলে সে কীভাবে বুঝবে যে, এতটা বাজে আর এখন আমি অমুক অমুক কাজ করব? আল্লাহ্ তা'লা চোখ খুলে দিলে নামায পড়ে নিই, অন্যথায় অপারগতা হয়ে থাকে, কেননা তখন এলার্ম ঘড়ি ছিল না। একথা শুনে মহানবী (সা.) বিস্মিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যেরূপ ঈমান ছিল তা তাঁকে কখনোই এমন উদাসীন হতে দিত না যে, তাহাজ্জুদের সময় পার হয়ে যাবে আর তিনি জাগবেন না। তাই তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু এতটুকু বলেছেন যে, মানুষ কথা মান্য করে না, বরং বিতণ্ডা করে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তোমার চেষ্টা করা উচিত ছিল যেন সময় নষ্ট না হয়, এভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত হয় নি। অতএব হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি আর কোন দিন তাহাজ্জুদের নামায বাদ দিই নি।

(আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮৮-৫৮৯)

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছেআর আগামীতেও চলবে ইনশাআল্লাহ্।

বর্তমানে পাকিস্তানের পরিবেশ-পরিস্থিতি আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠছে। সরকারের কিছু কর্মকর্তা মৌলভীদের অনুসরণ করে এবং তাদের সাথে গাঁটছড়া বেধে আমাদের যতটা ক্ষতি করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করছে। আপনারা বিশেষভাবে দোয়া করুন। রাবওয়ার আহমদী এবং পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বসবাসকরী আহমদীদেরও আল্লাহ তা'লা সর্বত্র স্বীয় নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় দিন এবং শত্রুর অনিষ্ট থেকে তাদের নিরাপদ রাখুন আর তাদেরকে ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন এবং অচিরেই এসব লোকের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন।

এরপর অর্থাৎ জুমুআর নামাযের পর আমি কয়েক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব, সংক্ষেপে তাদের কিছুটা স্মৃতিচারণ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে জনাব কমাণ্ডার চৌধুরী মুহাম্মদ আসলাম সাহেবের, যিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন আর গত ২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-

কমাণ্ডার সাহেব ১৯২৯ সনে গুজরানওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুজরানওয়ালা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তালীমুল ইসলাম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন আর লাহোর সরকারী কলেজ থেকে বি এস সি করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে তিনি পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি করার সুযোগ লাভ করেন। এরপর ১৯৪৮ সনে তিনি ফুরকান বাহিনীতে যোগ দিয়ে (পাক-অধিকৃত) কাশ্মীরে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, যেখানে তাকে 'মুজাহেদ-এ-কাশ্মীর' সনদ এবং 'আযাদী-এ-কাশ্মীর' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

১৯৫৫ সালে মরহুম পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন, যেখানে তিনি পাকিস্তানের নেভাল একাডেমীতে ডাইরেক্টর অফ স্টাডিয, কোহাট-এ ডেপুটি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড, নেভাল হেড কোয়ার্টার ইসলামাবাদ-এ ডেপুটি ডাইরেক্টর, নেভাল এডুকেশনাল সার্ভিসেস সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম শিক্ষা বিভাগে নেভির নতুন স্কুল এবং কলেজ চালু করার পরিকল্পনা প্রণয়নও নেভাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালনেরও তৌফিক লাভ করেছেন। পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে অবসরের পর তিনি কানাডা চলে যানএবং টরেন্টোর মিশন হাউজে এক বছর ওয়াকফে আরযী করেন। এরপর ১৯৯৩ সালে অবসরোত্তর ওয়াক্‌ফ করার আবেদন করলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তা গ্রহণ করেন। তার জামাতের সেবা সুদীর্ঘ ২৮ বছরপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে মরহুম সেক্রেটারী জায়েদাদ, সেক্রেটারী রিশতানাতা, এডিশনাল সেক্রেটারী মিশন হাউজ এবং হোমিওপ্যাথি ক্লিনিকে সহকারী হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। মরহুম অত্যন্ত নম্রভাষী,বিনয়ী সবার প্রতি স্নেহশীল নামাযের প্রতি নিষ্ঠাবান, খিলাফতের সাথে আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। জীবন উৎসর্গ করার পর তিনি প্রতিটি মুহূর্ত জামা'তের সেবায় নিয়োজিত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। বিগত কিছুকাল যাবৎ বেশ অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই সুস্থতা অনুভব করতেন তখনই মিশন হাউজে চলে আসতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধর্মের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তার পেছনে স্ত্রী এবং তিন পুত্র রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার পুণ্যসমূহ তার সন্তান-সন্ততির মাঝেও চলমান রাখুন। তার পুত্রবধু নুসরত জাহাঁ বলেন, মরহুম অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়ার্দ্র এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একজন আদর্শ স্বামী ও পিতা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিতে থাকেন যে, জামা'ত ও খোদার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা আর নিয়মিত নামায পড়া একান্ত জরুরী। তিনি নিজেও সারা জীবন তাহাজ্জুদ এবং (অন্যান্য) নামায নিয়মিত আদয় করেছেন।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া শাহিনা কুমর সাহেবার। তিনি নাযারাত উলীয়ার ড্রাইভার কুমর আহমদ শফিক সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। শাহিনা কুমর সাহেবা এবং তার ছেলে স্নেহের সামার আহমদ কুমর গত ১২.১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে দুপুর সোয়া একটার সময় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-

মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স ছিল ৩৮ বছর আর স্নেহের সামার আহমদ কুমরের বয়স ছিল ১৭ বছর। শাহিনা কুমর সাহেবা শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্বামী এবং ২ মেয়ে,১ ছেলে ছাড়াও ৩ ভাই রেখে গেছেন। শাহিনা কুমর সাহেবার মেয়ে বলেন, আমার মা অনেক পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। আমাকে সর্বদা পুণ্যকর্মের উপদেশ দিতেন। তিনি নিজেও সর্বদা পুণ্যকর্মে সর্বাগ্রে থাকতেন। সকল বিষয় আমার সাথে শেয়ার করতেন। আমার অনেক ভালো বান্ধবীও ছিলেন। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এটি লিখেছেন যে, মাশাআল্লাহ্, জামা'তের কাজের প্রতি তিনি অনেক আকর্ষণ রাখতেন এবং কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তার স্বামীও লিখেছেন যে, স্বল্প শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অতি উত্তমরূপে ঘর পরিচালনা করেছেন এবং সন্তানদেরও উত্তম তরবিয়ত করেছেন।

এরপর কুমর আহমদ শফিক সাহেবের পুত্র স্নেহের সামার আহমদ কুমর সাহেবের স্মৃতিচারণ করছি। সেও সড়ক দুর্ঘটনায় তার মায়ের সাথেই মৃত্যুবরণ করে। তালিমুল ইসলাম কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পড়াশোনায় ভালো ছিল। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খোদ্দামদের সাথে দায়িত্ব পালন করত। জামা'তী কাজে খুবই সক্রিয় ছিল। যখনই যয়ীমের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হতো তখনই সে, সব কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। তার পিতা লিখেন, কখনো কখনো ৩-৪ দিনের জন্য আমি সফরে চলে যেতাম; তখন সে বলত, আব্বু আপনি চিন্তা করবেন না আমি বাড়ির দেখাশুনা করবো। আপনি নিশ্চিন্তে আপনার দায়িত্ব পালন করুন;বা স্তবে সে এমনই ছিল। অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছেলে ছিল।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir